পতিহারা

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য

মহালক্ষ্মী পাব্‌লিসিং হাউস
পোঃ রতনগঞ্জ, ভওখালি—যশোহর

১৩৩১ সাল

মূল্য- এক টাকা

নিবেদন।

ভুল-ভ্রান্তি প্রত্যেকেরই আছে, এমন কি, প্রাজ্ঞ মুনি-ঋষিদের পর্য্যন্তও আছে। সে ক্ষেত্রে আমার ন্যায় অজ্ঞ—নিতান্ত অজ্ঞের ভুল-ভ্রান্তি থাকবে, এ বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি?

অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। সুতরাং আমার লেখার অনেক দোষ আছে। অতএব আশা করি—সহৃদয় পাঠক পাঠিকারা নিজগুণে আমার দোষ সেরে নিবেন।

গত আট বৎসর ধ'রে অনেক ছোট প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক লিখেছি। সেগুলি লেখার পর প'ড়ে দেখে আমার নিজের পছন্দ না হওয়ায় তখনই ছিঁড়ে ফেলেছি। তিনটি মাত্র লেখা আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান মধুসূদন ভায়া ছিঁড়তে দেয় নি। সে তিনটি লেখার মধ্যে এই একটী লেখা "পতিহারা" নামে আমার কনিষ্ঠ খুল্লতাত শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আমার প্রতি অগাধ স্নেহের জন্য পুস্তকাকারে বের হ'ল।

এই পুস্তিকাখানা প'ড়ে যদি আপনাদের ভাল লাগে, তবে তার প্রতিদানে আমার লক্ষ্মণ-সম ভ্রাতাকে ধন্যবাদ দেবেন। আর যদি ভাল না লাগে, তবে আমার অজ্ঞতা ব'লে আমাকে ক্ষমা ক'রবেন। কিন্তু একটা কথা জানবেন—বইখানা খুব ব্যথা অনুভব ক'রে লেখা! পারেন যদি—এ ব্যথার প্রতিকার করবার চেষ্টা করবেন—এই আমার নিবেদন।

একটী কথা বলা বাকী র'য়ে গেল। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর পান মহাশয় আমার এ পুস্তকখানার জন্য অনেক ভাবে অনেক পরিশ্রম ক'রেছেন। তাঁকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। ইতি।

গ্রন্থকার।

শ্রীযুক্তা লাবণ্যময়ী দেবী

সমীপেষু

দিদিমণি!

চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের কিশোরী তুমি! তোমার যৌবন প্রস্ফুটিত হবার পূর্ব্বেই তুমি সংসারের সকল সুখ হ'তে বঞ্চিতা হ'য়েছ! তোমার সন্তঃ-শোকের আগুন নিভাতে আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম ক'রে তোমার জন্য এই বইখানা লিখেছি। জানি না, তোমার জন্য লিখিত এই পুস্তকখানা তোমাকে শান্তি দিতে পারবে কি না? দুই একটা কথা লেখা ছাড়া আমার ত' আর কোন শক্তি নেই!—তা'ও যদি ভাল লিখ্‌তে পার্‌তাম—লেখ্‌বার শক্তিও যে আমার নেই! প্রাণের মধ্যে অনেক কথা আছে,—কিন্তু কলম দিয়ে যে সেগুলি বার কর্‌তে পারি না! তবে তোমার ব্যথায় আমি ব্যথিত, এইটুকু বুঝে তুমি যদি প্রাণে একবিন্দুও শান্তি পাও, তবে আমার প্রাণটাও একটু শান্তি পাবে। ইতি।

১লা আশ্বিন ১৩৩১ সাল।
কৈলাস আশ্রম ভওখালি

তোমার স্নেহের ভাই—
বিশু।

বক্তব্য।

—(০)—

বহু যন্ত্রণা সহ্য ক'রে, মাতা যখন তাঁর নবজাত শিশুর মুখখানি দর্শন করেন, তখন তাঁর প্রাণ যেমন ভাবে আনন্দে নেচে ওঠে, আমারও প্রাণ ঠিক্ তেম্নি ভাবে নেচে উঠেছিল,—আমার এই নবপ্রকাশিত পুস্তিকা-খানি দর্শন ক'রে !

সন্তান প্রসব ক'রে মাতা অন্যদিকে চক্ষু ফিরাতে চান না, একদৃষ্টে কেবল আপন সন্তানের চাঁদমুখখানির পানে চেয়ে থাকেন, কিন্তু চেয়ে থাকৃতে থাকৃতে যদি দেখেন,—তাঁর সে সন্তান আর বেঁচে নেই,—ম'রে গিয়েছে, তখন তাঁর প্রাণে যেমন দারুণ অবক্তব্য ব্যথা লাগে,—সে ব্যথা লিখে জানান যায় না, ভাষায় কহা যায় না ; আমারও ঠিক্ তেম্নি ব্যথা লেগেছে, যখন দেখ্‌লাম—আমার এ বইখানি একটা শোকাবহ ব্যাপার নিয়ে লেখা !

বই লেখার ইচ্ছেটা আমার অনেক দিন থেকেই ছিল। একজনের চোখের জল দেখে, চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে লিখে, সে ইচ্ছেটা যে পূর্ণ কর্‌তে হবে—এ আমি কোন দিন স্বপ্নেও কল্পনা কর্‌তে পারিনি !

যাক্ সে কথা। চোখের জল যদি চোখের জল থামাতে পারৃত,—তা' হ'লে, আমি জন্মভ'রে চ'খের জল ফেল্‌তে রাজী ছিলাম ! কিন্তু চ'খের জলে যে চোখের জল বন্ধ হয় না !

অশ্রুজল ফেল্‌তে ফেল্‌তে বইখানি লিখেছি বটে,—কারণ, অশ্রুজল ছাড়া পতিহারাকে দিবার আমার ত' কিছুই নাই—কোন শক্তিও নাই—.

কোন সামর্থ্যও নাই,—কিন্তু অশ্রুজল ফেলে এখনও যে আমার আশা পূর্ণ হয়নি!—হৃদয়ের ব্যথা লিখে, এখনও যে আমার আবেগ মেটেনি!—সে দোষ আমার প্রাণের নয়,—আমারি অজ্ঞ লেখনীর!

আমার লেখনী বিজ্ঞ হ'লেও, আমার সে আশা মিট্‌বে না! প্রাণের আবেগ তেমনি থেকে যা'বে!

আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের আশা, আবেগ মিট্‌বে, সেইদিন—যে দিন দেখ্‌ব,—পতিহারাদের নীরব চীৎকার থেমে গিয়েছে—পতিহারাদের স্তব্ধ হাহাকার অনন্তে মিলিয়েছে,—পতিহারারা নির্জ্জন গৃহকোণে ব'সে আর তপ্ত-অশ্রু ফেলে না—পতিহারাদের মুখে আর মলিনতা নেই—তারা আবার হাস্‌তে শিখেছে—তারা আবার কথা বল্‌তে সুরু ক'রেছে—তারা আবার গান ধ'রেছে! সে আশা কি আমার পূর্ণ হবে না! আমার প্রাণের মাঝে কে যেন চীৎকার ক'রে বল্‌ছে, "হাঁ্যা, তোমার আশা পূর্ণ হবে—নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে!" সেই দিনের জন্যই যে আমি ব'সে আছি! নিবেদন—ইতি।

কৈলাস-আশ্রম।
ভওখালি; নড়াইল।
যশোহর।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য।

পতিহারা

১

"বাবা!"

কন্যা শেফালী রুক্ষস্বরে ডাকিল, "বাবা!" পিতা চন্দ্রনাথ বাবু তখন সবেমাত্র আহারে বসিয়াছিলেন। কন্যার রুক্ষ আহ্বানে তিনি স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "কি মা?"

শেফালী তেমনি রুক্ষস্বরে কহিল, "তোমার মুখে ভাত উঠ্‌ছে?"

চন্দ্রনাথ বাবু তেমনি কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা! কি হ'য়েছে?"

"হবে আবার কি? দেখ্‌তে পাচ্ছ না—চ'খের সাম্‌নে এক আইবুড়ো বুড়ী ধিড়িঙ্গী মেয়ে? তোমার জন্য কারো কাছে মুখ দেখান ভার হ'য়েছে। পাড়ার লোকেরা বল্‌ছে 'বড় ঘরের মেয়ে, ওরাই সমাজের কর্ত্তা, ওদের আর জাত যাবে না। আমাদের ঘরে ঐ রকম আইবুড় মেয়ে থাক্‌লেই হ'য়েছিল আর কি!' আরও কত কি বল্‌ছে—তা'ত মুখে আনা যায় না।"

মধ্যমা কন্যা চামেলী পিতার পার্শ্বে বসিয়া পিতাকে বাতাস দিতেছিল। তাহারই বিবাহের কথা হইতেছিল শুনিয়া, সহসা তাহার গণ্ড রক্তিমাভা ধারণ করিল। সে ব্যজন রাখিয়া ধীরপদে ব্রীড়াবনত-মুখে, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহার শয়নকক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া পালঙ্কোপরি শয্যায় শুইয়া পড়িল।

শেফালীর কথা শুনিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর আহারে আর প্রবৃত্তি হইল না। কেমনই একটা অবক্তব্য বেদনায় তাঁহার সর্ব্বশরীর দহিত হইতে লাগিল। তিনি পাত্রত্যাগ করিলেন। তাহা দেখিয়া শেফালী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পিতা তাহার কথায় এমনভাবে অভুক্ত অবস্থায় পাত্রত্যাগ করিবেন, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। চন্দ্রনাথ বাবুর স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী এ দৃশ্য দেখিয়া হেঁসেলের কোণে বসিয়া নীরবে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া অশ্রু মুছিলেন।

গ্রীষ্মকাল। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-রশ্মি জীবন্ত পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে রশ্মি এত উজ্জ্বল যে, তাহার দিকে দৃষ্টি করিবামাত্র চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে। শীতল বাতাস একেবারেই নাই। মাঝে মাঝে অত্যুষ্ণ বাতাস বহিয়া জীবজন্তুর গাত্রে কেমনই একটা অসহ্য দাহর সৃষ্টি করিতেছে। শ্রাবণের বর্ষার ধারার মত মানুষের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অবিশ্রান্ত স্বেদবিন্দু ঝরিতেছে।

রাজপথ শূন্য। পথঘাট নির্জ্জন। বিপণীশ্রেণীতে কোলাহল নেই। এমন অসময়ে চন্দ্রনাথ বাবু ভারাক্রান্ত মনে পাত্রান্বেষণে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। সঙ্কল্প রহিল, পাত্র স্থির না করিয়া কিছুতেই গৃহে ফিরিবেন না।

চন্দ্রনাথ বাবুর অবস্থা ভাল। এক কথায় তাঁহাকে ধনী বলা যাইতে পারে। তাঁহার সম্পত্তির খাজনা আদায়ের জন্য দুই চারি জন কর্ম্মচারী এবং বরকন্দাজ আছে। তাহারা চন্দ্রনাথ বাবুর সর্ব্বপ্রকার আদেশ প্রতিপালন করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। তাঁহার আদেশে তাহারা তাঁহার কন্যার জন্য বহু পাত্রের সন্ধান দিয়াছিল। তিনিও বহু ঘটক নিযুক্ত করিয়া বহু পাত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোনটিই তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর পাত্র পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। কয়টী মানুষের ভাগ্যে

তাহা ঘটিয়া থাকে ? উচ্চবংশীয়, সচ্চরিত্র, ধনবান্, গুণবান্, বিদ্বান্, সম্ভ্রান্ত, সুশ্রী একাধারে এতগুলি বিশেষণে বিশেষিত কয়টি পাত্র মেলে ?

চন্দ্রনাথ বাবু বহু পাত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন—কোনটি উচ্চবংশীয় কিন্তু নিরক্ষর, কোনটি ধনবান্ কিন্তু অসচ্চরিত্র, কোনটি গুণবান্ কিন্তু দরিদ্র, কোনটি বিদ্বান্ কিন্তু কুৎসিত, কোনটি সুশ্রী কিন্তু মূর্খ। সেই জন্যই এতদিন কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর পাত্র পাইলেই বিবাহ দিবেন, এই স্থির করিয়া ঘটক এবং কর্ম্মচারীদের উপর এইরূপ আদেশ জারী করিয়া নিশ্চিন্ত-মনে বসিয়াছিলেন। কিন্তু আজ জ্যেষ্ঠা কন্যা শেফালীর কথায় তাঁহার চমক ভাঙ্গিল এবং পাড়াপ্রতিবাসীদের রূঢ় কথায় তিনি হৃদয়ে অত্যধিক বেদনা অনুভব করিয়া সুপাত্র অন্বেষণে দারুণ গ্রীষ্মের পাষাণ-ফাটা রৌদ্রের মধ্যেই বাটী হইতে বাহির হইলেন।

এ যে কন্যার বিবাহ! মান-মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া ভিক্ষুকবেশে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে! কাঙ্গালের মত পাত্রের পিতার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে হইবে! তাহার পর যদি পাত্রের পিতার অনুগ্রহ হয়, তবে পাত্রীর পিতার চিরদিনের জন্য গুরুতর অপরাধে অপরাধীর মত জীবন যাপন করিতে হইবে। হায়রে কন্যার পিতার জীবন!

২

ত্রয়োদশবর্ষীয়া চামেলী দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যার উপর এলাইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—বিবাহ কি ? বিবাহ না হইলে জাতি যায় কেন ? বিবাহ না হইলে ক্ষতি কি ? পুরুষের বিবাহ না হইলে জাতি যায় না, কেবল কন্যাদের বেলায় যায় ? কন্যারা কি অপরাধ করিয়াছে ? কেন তাহারা সমাজের চক্ষে এত হীন ? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই কঠিন প্রশ্নগুলির উত্তরের কোন সমাধান করিতে না পারিয়া সে

ভাবিতে লাগিল—তাহার নিজের কথা। সে যদি পিতার কন্যা না হইয়া জন্মগ্রহণ করিত, তবে তাহার জন্য তাহার পিতাকে প্রতিবাসীদিগের মর্ম্মভেদী কথায় ঘৃণাবনত-মুখে, বেদনাপ্লুত-হৃদয়ে অভুক্ত অবস্থায় এই নিষ্ঠুর গ্রীষ্মের মধ্যে বাহির হইতে হইত না।

সে ধনী-কন্যা বলিয়া তাহার বড় গর্ব্ব ছিল। কিন্তু এখন কোথায় তাহার সেই গর্ব্ব? ধনী কে? হিন্দু-কন্যার পিতারা কি কখনও ধনী হইতে পারে? তাহারা যে চির-দরিদ্র—চির-কাঙ্গাল! তাহারা যে ভিক্ষুকের চেয়েও অধম—পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর চেয়েও পরাধীন—হত্যাকারীর চেয়েও অপরাধী!

তাহার বড় ইচ্ছা হইল যে, সে দৌড়াইয়া গিয়া তাহার পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাস্তা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া বলে, "বাবা! থাকুক্ আমার বিয়ে। আমার বিয়ের জন্য তোমার এত দুঃখ কষ্ট সহিবার প্রয়োজন নেই। আমি চিরদিন অবিবাহিতা থাক্‌ব—চির-কৌমার্য্য-ব্রত গ্রহণ কর্‌ব—তা'তে যদি তোমার জাত যায়—জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ভস্মে পরিণত হব। তখন ত' তোমার জাত যাবে না—তখন ত' কেউ রূঢ় কথা ব'লে তোমার হৃদয়ে শেল বেঁধাতে পার্‌বে না! পিতা, পুত্র-কন্যা কামনা করে কেন?—শান্তির জন্য ত? কিন্তু তাদের জন্য শান্তির পরিবর্ত্তে যদি অশান্তির সৃষ্টি হয়, তবে তাদের দিয়ে কি হবে? বাবা! তুমি ফিরে এসো।"

কিন্তু সে পারিল না—কেমনই একটা সরম আসিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া রাখিল। সে শয্যা ত্যাগ করিল না। তেমনি ভাবে শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—পাত্রের পিতার কথা। কি নিষ্ঠুর ইহারা! ইহাদের প্রাণে এক বিন্দু দয়া নেই—মায়া নেই,—স্নেহ নেই—করুণা নেই—অনুকম্পা নেই, আছে শুধু নিষ্ঠুরতা—নির্দ্দয়তা—নির্ম্মমতা! তাহা না

হইলে কন্যার পিতার দিকে এক বিন্দু করুণা দৃষ্টি না করিয়া কুশীদজীবী সাইলকের মত নিষ্ঠুর হইয়া তাহার গাত্র হইতে মাংস কাটিয়া লইয়া তাহাকে জীবন্ত সমাধি দিতে প্রয়াস পায়? পুত্র বিক্রয়! কোথায়ও পুত্রের মাংসের মণ হাজার, কোথায়ও পাঁচ হাজার, কোথায়ও দশ হাজার, কোথায়ও বিশ হাজার, কোথায়ও তাহারও অধিক! এমনি উচ্চহারে পুত্রের মাংস পিতা কসাইদারের মত বিক্রয় করেন। কিন্তু এ খরিদ-বিক্রয় এক অদ্ভুত রকমের। বিক্রেতা ক্রেতাকে দ্রব্য দিয়া তাহার বিনিময়ে অর্থ নেয়, কিন্তু এখানে বিক্রেতা ক্রেতাকে মাত্র এক রাত্রের জন্য পুত্রটিকে দেয়। সেই এক রাত্রি দিবার বিনিময়ে পাইয়া থাকে মণ-হিসাবে অর্থ, আরও একটা ক্রীতদাসী, যাহারা জন্মগ্রহণ করে—পিতাকে চিরান্ধকার অশান্তির মাঝে ডুবাইয়া রাখিতে, আর নিজেরা আপন গৃহ, মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ত্যাগ করিয়া কোন্ এক অজানা, অচেনা গৃহে যাইয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত অপরিজ্ঞাতদের বড় আপনার করিয়া লইয়া লাঞ্ছিতা, প্রপীড়িতা, নির্য্যাতিতা হইতে থাকে।

৩

করুণসুরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। শুভদিনে যতীন্দ্রনাথের সহিত চামেলীর বিবাহ হইল বটে, কিন্তু শুভক্ষণে হইল কিনা বলা যায় না। বিবাহ হইয়া গেল। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু কন্যার বিবাহ দিলেন। এই বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া যাইবার পরও তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না। যদিও তাঁহার তৃতীয়া কন্যা জুমেলী তখন বালিকা মাত্র, তথাপি তিনি জুমেলীকে পাত্রস্থ করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী কহিলেন, "এত ব্যস্ত কি? জুমেলীকে অনায়াসে আরও চার বৎসর রাখা যাবে।"

এই কথায় চন্দ্রনাথ বাবু উত্তর দিলেন, "তা' হোক্, আমি শীঘ্রই জুমীর বিয়ে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'স্‌ব।"

চামেলীর বিবাহের দুই মাস পরেই নন্দকুমারের সহিত জুমেলীর বিবাহ হইয়া গেল। চন্দ্রনাথ বাবু এই বিবাহে গৌরী-দানের ফল লাভ করিলেন। এই বিবাহে ধুমধাম তত হইল না; কারণ, বিবাহটা হঠাৎ স্থির হইল এবং অল্প দিনের মধ্যেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইল।

চন্দ্রনাথ বাবু তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু কন্যার পিতার মনে কি কখনও শান্তি থাকিতে পারে? পুত্রের মাতারা অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া কন্যার পিতার মনে বড় ব্যথা দিয়া থাকেন। তাঁহারা কুটুম্বিতার প্রকৃত অর্থ কখনও অনুধাবন করিতে পারেন নাই, চেষ্টাও করেন নাই,—তাঁহারা কুটুম্বিতা অর্থে নিশ্চয়ই এই বোঝেন যে, কন্যার পিতা যেমন করিয়াই হউক নিজের ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া অথবা বিক্রয় করিয়া অথবা চুরি-ডাকাতি করিয়া, পুত্রের পিত্রালয়ে অর্থাৎ কন্যার শ্বশুরালয়ে বার মাসে তের পর্ব্বে কেবল তত্ত্বই পাঠাইবেন। তত্ত্ব লইবার সময় তাঁহাদের বেশ মনে থাকে যে, তাঁহারা পুত্রের মাতা। কিন্তু তত্ত্ব পাঠাইবার সময় তাঁহারা যে কন্যার মাতা, একথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যান। কন্যার পিত্রালয় হইতে যত মূল্যবান্ দ্রব্যাদিই আসুক না কেন, পুত্রের মাতাদের নিকট সেগুলি অতি কদর্য্য। সেগুলিকে শুধু কদর্য্য বলিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হয়েন না, পাড়ার বউ-ঝিদের ডাকিয়া আনিয়া সেগুলি দেখাইয়া বলেন—"বেয়াই সম্বন্ধ আর ঠিক রাখতে দিলেন না দেখ্‌ছি। ছোট লোক, ছোট প্রবৃত্তি। মেয়ে-জামাইকে দিচ্ছেন, পরকে ত দিচ্ছেন না? দেখত তোমরা—এসব জিনিস কি কেউ কুটুম্বকে দিতে পারে? গরীব দুঃখীকেও ত এসব জিনিস কেউ দেয় না।"

চন্দ্রনাথ বাবুকেও মাঝে মাঝে এইরূপ কথা অনেক শুনিতে হইত। কন্যার পিতা তিনি, সকলই নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেন।

৪

রজনী দ্বিপ্রহর। পৃথিবী নীরব নিস্তব্ধ। আকাশ নির্ম্মল। চন্দ্রমা আপন মনে হাসিয়া হাসিয়া পূর্ব্বাকাশ হইতে পশ্চিমাকাশে মৃদু-পাদবিচরণে চলিয়াছে। চন্দ্রমার এমন সুন্দর ভুবন-ভোলান হাসি দেখিতে এক শয্যায় শায়িত যুবক যুবতীরাই জাগিয়া আছে। তাহারা চন্দ্রমার সে হাসির মাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পরস্পরের সহিত প্রেমালাপ করিতেছে।

যতীন্দ্রনাথের শয়নকক্ষের জানালা উন্মুক্ত ছিল। তাহার ভিতর দিয়া চাঁদের শুভ্র-জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়া কক্ষটিকে আলোকিত করিয়াছিল। মাঝে মাঝে মৃদুমন্দ মধুর সমীরণ সেই গবাক্ষের মধ্য দিয়া দ্বিধা না করিয়া কক্ষে ঢুকিয়া কক্ষটীকে আলোড়িত করিতেছিল।

শুভ্র কোমল শয্যায় যতীন্দ্র এবং চামেলী বিনিদ্র-নয়নে চকোর চকোরীর মত বসিয়া মৃদুস্বরে কত গুপ্ত, গুপ্ত, লুপ্ত কথা কহিতেছিল।

যতীন্দ্রনাথ কহিল, "চামেলি! তুমি আমায় ভালবাস?

চামেলী সে কথার কোন উত্তর দিল না, সরমে মুখ নত করিল।

"বল না; লজ্জা কি? এখানে ত কেউ নেই।"

চামেলী তথাপি নীরব।

"বলবে না? আচ্ছা। তোমার সঙ্গে আর কথা ব'লব না।" এই বলিয়া যতীন্দ্রনাথ শুইয়া পড়িল। চামেলী সশব্দে এক সুদীর্ঘ তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলিল।

এই নিঃশ্বাস যতীন্দ্রনাথের বুকে শেলসম বিঁধিল। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিয়া চামেলীকে কোলে টানিয়া আনিয়া বামহস্ত চামেলীর স্কন্ধের

উপর ন্যস্ত করিয়া এবং দক্ষিণ হস্ত তাহার কোমল বক্ষের উপর স্থাপিত করিয়া স্নেহপূর্ণ কোমলকণ্ঠে কহিল, "চামেলি! তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্লে কেন?"

চামেলী কোন কথা কহিল না। নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

যতীন্দ্রনাথ তখন চামেলীর মস্তক নিজ স্কন্ধের উপর হেলাইয়া দিয়া, দুই বাহুদ্বারা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কথা কও চামেলি! অমন ক'রে চুপ্ ক'রে থাক্‌লে যে আমি ব্যথা পাই! বল, তুমি আমায় ভালবাস?"

কোমল-কম্পিত-কণ্ঠে চামেলী উত্তর দিল, "বাসি।"

"আমি কাল ব'লে ত ঘৃণা কর না?"

"না।"

"সত্য বল্‌ছ?"

"সত্যই বল্‌ছি।"

"আশ্চর্য্য লোক তুমি!"

"কেন?"

"কাল কে পছন্দ করে? সকলেই চায় সুন্দর! তুমি যদি কাল হ'তে, তা'হলে আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, আমার তোমাকে পছন্দ হ'ত না।"

"আমি কি সুন্দরী?"

"সুন্দরী না? তুমি যে জগতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, হেলেনের চেয়েও সুন্দরী। তোমার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পায় তখন, যখন রন্ধনশালার উনানের ধারে ব'সে রাঁধ, মুখখানা ঘোমটাবৃত না থেকে উন্মুক্ত থাকে, আর সেই মুখের উপর ঐ উনানের রক্তিম আলোক এসে পড়ে' মুখখানিকে রক্তিমাভা ধারণ করিয়ে দেয়।"

সলজ্জ হাসি হাসিয়া চামেলী বলিল, "যাও, তোমার আর ঠাট্টা করতে হবে না।"

"ঠাট্টা নয়, সত্যই। কিন্তু তুমি কি অদ্ভুত! আচ্ছা, আমাকে দেখে কোন দিনও তোমার ঘৃণা হয় নি? সত্য বল—আমাকে ছুঁয়ে বল।"

"বিয়ের আগে যখন শুনেছিলাম যে তুমি কাল, তখন সত্যই আমার ঘৃণা হ'য়েছিল, তখন ভেবেছিলাম, কাল মানুষকে কি ক'রে ভালবাসব? কিন্তু এখন আর সে সব কিছু নেই। এখন ত আমি তোমাকে কাল দেখি না। এখন তোমার অদর্শন আমার মনের মধ্যে কেমনই একটা অশান্তির সৃষ্টি করে, এখন জাগরণে সদাই তোমাকে আমার চোখের সাম্নে দেখি, নিদ্রায় তোমার সঙ্গে কত কথা কই। কাল কি মন্দ? কালই যে জগতের আলো। কিন্তু সময় সময় বড় দুঃখ হয়, চ'খের জল না ফেলে থাকতে পারিনে,—যখন কেউ কেউ আমার সাম্নে তোমাকে কাল ব'লে নিন্দা করে; তারা তোমায় ঘৃণা করে। কিন্তু তারা যদি আমার এই চোখ দু'টি নিয়ে দেখত, তবে কি তারা তোমায় কাল বলতে পারত?" এই কথা বলিতে বলিতে চামেলীর নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। যতীন্দ্রনাথ কণ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া অতি মৃদুস্বরে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বুকের ব্যথা কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করিয়া লইল।

উভয়েই নীরব। ভগবান তাহাকে কেন কাল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন—যতীন্দ্রনাথ এই কথা ভাবিয়া মনে কেমনই একটা দুঃখ অনুভব করিতেছিল। চামেলী ভাবিতেছিল—কাল কি এতই হেয়? কিন্তু যাহা কিছু মহান, যাহা কিছু পবিত্র, সবই ত এই কালর মধ্যে। কোকিল কাল, কি সুমিষ্ট তাহার কণ্ঠ! সমুদ্রের জল কাল, কি সুন্দর সেই দৃশ্য—অনন্ত অম্বুরাশি অসংখ্য বীচিমালায় পরিশোভিত! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাল,

কি সুমধুর তাঁহার বাঁশী—যাহাতে যমুনার কাল জল উজান বহিত! তবে মানুষ কাল হইলে মানুষে এত ঘৃণা করে কেন?

এইরূপে উভয়ে নীরবে ভাবিতে লাগিল। সে গভীর নীরবতা হঠাৎ ভঙ্গ করিয়া অদূরে শৃগালদল "হুক্কা হুয়া" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিয়া রজনীর তৃতীয়-প্রহর ঘোষণা করিয়া তাহাদের চিন্তা-স্রোতে বাধা দিল।

যতীন্দ্রনাথ চামেলীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাব্‌ছ?"

চামেলী উত্তর দিল, "ভাব্‌ছিলাম কত কি, তুমি কি ভাব্‌ছিলে?"

"ভাব্‌ছিলাম একটা কথা, যাক্। আচ্ছা চামেলি! মানুষ কি চায়?"

"শান্তি।"

"কিসে পাওয়া যায়?"

"মহাভারতে শুনেছি অঋণী থাক্‌লে। কিন্তু আমার মনে হয়, মানুষ মানুষের নিন্দা যদি না করে—তবেই বোধ হয় শান্তি পাওয়া যায়।" যতীন্দ্রনাথ এই কথায় নাতিদীর্ঘ একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "চামেলি! মা-বাপ ভাই-বোন ছেড়ে আমার কাছে থাক্‌তে তোমার ইচ্ছা হয়? মনে কষ্ট হয় না?"

"স্বামীর কাছে থাক্‌তে কার না ইচ্ছা হয়? সে জন্য কি কারো কষ্ট হয়?—তা'তে পরম আনন্দ—পরম তৃপ্তি!"

"সেই ত মেলি! আমার সময় সময় মনে হয়, একটা ছোট বাসা ক'রে তোমায় নিয়ে কল্‌কাতায় থাকি। মেসে থাক্‌তে আমার বড় কষ্ট হয়। ঠাকুরের রান্না খাওয়াও যায় না—উপবাসও করা যায় না। কিন্তু তোমাকে নিয়ে কল্‌কাতায় বাসা কর্‌লে মানুষে বল্‌বে কি!"

"দরকার কি? এই সেদিন আমাদের বিয়ে হ'ল, এখনই যদি বাসায় নিয়ে যাও, তবে লোকে তোমাকে স্ত্রৈণ বল্‌বে।"

"বলে বলুক। মানুষের কথায় কি আসে যায়? আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসব, তাকে সুখী কর্‌ব, নিজে শান্তি পাব, তাতে অপরের কি?"

"আমি ত আগেই বলেছি,—মানুষ যদি মানুষের বিরুদ্ধে কিছু না বল্‌ত, তবে ত সংসারটা বড় শান্তির স্থান হ'ত।"

"আচ্ছা মেলি! তোমার কি সাধ হয়?"

"আমি স্ত্রীলোক, আমার আবার সাধ কি?"

"না, মেলি! বল, কি তোমার ইচ্ছা করে? তুমি হয় ত জান না, আমি তোমায় কত ভালবাসি! তোমার একটী ক্ষুদ্র বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য, প্রয়োজন হ'লে, আমি স্বহস্তে এই বক্ষ চিরে তপ্ত লবণাক্ত রক্ত অকাতরে দিতে পারি। বল, তোমার হৃদয়ের বাসনা কি?"

"আমার মাত্র এক বাসনা,—দিবানিশ তোমার দর্শন।"

"উত্তম, এই যদি তোমার বাসনা হয়, তবে আর আমি কল্‌কাতায় যাব না। কিসের জন্য লেখাপড়া? তোমাকে এখানে ফেলে আমি বিদেশে গিয়ে এক বিন্দুও শান্তি পাব না। জীবনে যদি শান্তিই না পেলাম, তবে জীবনধারণ কিসের জন্য?"

"না, না, তা' হয় না; আমার জন্য কেন তুমি তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট কর্‌বে? তোমার পড়া আর কতদিনে শেষ হবে?"

"আর মাত্র এক বৎসর আছে।"

"তবে আর কি? আর একটা বছর বই ত নয়?"

"বই ত নয় কি রকম? একটা বছর তুমি এতই ক্ষুদ্র মনে কর্‌লে মেলী? মেলি! তুমি নিশ্চয় আমায় ভালবাস না, নৈলে একটা বছরকে নগণ্যের মধ্যে গণনা কর্‌তে পার্‌তে না।"

চামেলী মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "সে কথা তুমি বল্‌তে পার।"

চামেলী একটু ক্রুদ্ধ হইয়াছে. যতীন্দ্রনাথ স্পষ্ট তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিল, "রাগ কর্‌লে নাকি ?"

"না, আমি কার ওপর রাগ কর্‌ব ?"

"মেলি! আমায় ক্ষমা কর। আমি অন্যায় করেছি। তোমার পায় ধরি, আমায় ক্ষমা কর।"

"যাও. ও কি কথা ? তুমি গুরুজন হ'য়ে ও কথা ব'লে আমার স্কন্ধে আর পাপের বোঝা চাপিও না।"

চামেলীকে বক্ষের মধ্যে টানিয়া আনিয়া তাহার অধরে অধর রাখিয়া একটু স্নেহ করিয়া যতীন্দ্রনাথ কহিল, "চামেলি! আমার ওপর কি রাগ কর্‌তে আছে ? তুমি আমার ওপর রাগ ক'রে গম্ভীর হ'য়ে থাক্‌লে যে আমি বড় ব্যথা পাই। আমি যে তোমায় বড় ভালবাসি।"

"আমি বুঝি মোটেই বাসি না ?"

"বাস ; কিন্তু আমি যে তোমার এক মুহূর্ত্তের অদর্শনও সহ্য কর্‌তে পারি না মেলি!"

"আমি বুঝি পারি ?"

"তুমি এক বছর পার্‌বে ব'ল্লে যে!"

"না পেরে করি কি ? কর্ত্তব্য যে! আর এক বছরের মধ্যে ত তিন চার বার তোমার দেখা পাব।"

"তা'তে কি আর শান্তি পাওয়া যায়! সকল সময় চোখে চোখে থাক্‌লে কেমন শান্তি!"

"তুমিই ত সেদিন বলেছিলে, বিরহের পর মিলন বড় সুখের! চির-মিলনে যত সুখ শান্তি পাওয়া যায়, তার চেয়ে সহস্রগুণ সুখ শান্তি পাওয়া যায়—বিচ্ছেদের পর মিলনে।"

"তা সত্য, কিন্তু প্রাণ যে বোঝে না, সে চায় সতত তোমাকে চোখে চোখে রাখ্‌তে।"

"আর একটা বছর কোন রকমে কাটিয়ে দেও। আর এখন তোমার পাঠ্যাবস্থা, এখন কি আমাকে নিয়ে কল্‌কাতায় বাসা ক'রে থাকা তোমার উচিত?"

"আচ্ছা, তোমার জন্য আমার এমন হয় কেন? কোথায় কোন্ অজানা অচেনা দেশে সম্পূর্ণ অপরিচিতা হ'য়ে লুকিয়ে ছিলে, হঠাৎ এক জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে নানালোক-মাঝে সাক্ষাৎ হল, আর সেইক্ষণ হ'তেই তুমি যেন আমার কত পরিচিত, কত আপনার হ'য়ে গেলে। এখন তোমার অদর্শন যেন গুরু অপরাধের কঠোর শাস্তি; তোমার দর্শন যেন মহাসমুদ্রের মধ্যে সূর্য্যোদয়াস্ত। মা, যাঁর স্নেহ অতল অপার, যাঁর অন্তর শরৎ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত পবিত্র, যাঁর ভালবাসা নির্ম্মলাকাশের প্রভাত সূর্য্যের মত মহান্, যাঁর নিঃস্বার্থ অনুগ্রহ ভিন্ন সন্তান বাঁচে না, যাঁর স্নেহ ভালবাসা সন্তানের উপর সতত অবিশ্রান্তভাবে পতিত হয়—প্রতিদান কিছু চায় না, এমন মা'কে দু'দিন না দেখে থাকা যায়—কিন্তু তোমাকে না দেখে—"

কথা সম্পূর্ণ হইল না। বৃক্ষশাখায় "কা' কা" রবে কাক ডাকিয়া উঠিল। বাহির হইতে একটি শব্দ শোনা গেল। যতীন্দ্রনাথ জানালার মধ্য দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল—প্রভাত হইয়াছে; তাহার মাতা সশব্দে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিতেছেন।

৫

ছুটী ফুরাইল। দিন স্থির হইল। যতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিল। রওনা হইবার পূর্ব্বরাত্রে যতীনের এবং চামেলীর আদৌ ঘুম হইল না। চামেলী নীরবে উপাধান সিক্ত করিল, যতীন্দ্রের নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, কিন্তু

উছলিয়া পড়িল না। মাঝে মাঝে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেদনা লাঘব করিতে লাগিল। সে রাত্রিটা দুইজনে একরূপ নীরবে কাটাইল। কথাবার্ত্তা খুব কমই হইল। কি অভিশপ্ত এই রাত্রিটা! সম্মুখ বিরহের শেষ-মিলন-রাত্রি! স্বামীস্ত্রীর নিকট এমন রাত্রিগুলি কি ভীষণ!

যতীন্দ্রনাথ ওকালতী পড়িতেছিল। যদিও উকিল বাবুদের দল দিন দিন শুক্লপক্ষের শশিকলার মত বৃদ্ধি হইতেছিল এবং উপার্জ্জন কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রমার মত দিন দিন হ্রাস হইতেছিল, তথাপি সে পড়িতেছিল—তাহার পিতার আজ্ঞায়। আইন পাশ করিয়া ব্যবসা জম্‌কাইয়া বসিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা নিজ সংসারের জীবিকা অর্জ্জন করার তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। নিজ জমিদারীর মোকদ্দমাগুলির জন্য পর-মুখাপেক্ষী না হইতে হয়—এই জন্যই সে তাহার পিতার আদেশে আইন পড়িতেছিল।

এইবার কলিকাতায় আসিয়া হঠাৎ একদিন যতীন্দ্রনাথের জ্বর হইল। সাতদিন পরে সে অন্নপথ্য করিল বটে, কিন্তু জ্বর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইল না। চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

নন্দকুমার কলিকাতায় থাকিয়া আই এ, পড়িত। চামেলী মধ্যে মধ্যে তাহার নিকট পত্র লিখিত। এক তারিখে নন্দকুমার চামেলীর নিকট হইতে পত্র পাইল; তাহাতে যতীন্দ্রনাথের ঠিকানা এবং তাহার অসুখের কথা লেখা ছিল। এই পত্র পাইয়া সে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু তড়িৎকান্তিকে লইয়া যতীন্দ্রনাথের মেসে তাহাকে দেখিতে গেল। তড়িৎকান্তি ডাক্তারি পড়িত। নন্দকুমারের সহিত তাহার বাল্যকাল হইতে বন্ধুত্ব ছিল।

নন্দকুমার যতীন্দ্রনাথের মেসে আসিয়া তাহার কক্ষ-নম্বর জানিয়া লইয়া সেই কক্ষে গিয়া দেখিল, এক মলিন শয্যায় একটী রোগী শুইয়া আছে।

নন্দকুমার মনে মনে স্থির করিল, এই রোগীই যতীন্দ্রনাথ। যতীন্দ্রনাথের সহিত নন্দকুমারের এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। কোন কার্য্যবশতঃ যতীন্দ্র নন্দকুমারের বিবাহে যোগদান করিতে পারে নাই। সেজন্য সে অত্যন্ত দুঃখিত ছিল।

কক্ষমধ্যে দুইজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া যতীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কা'কে চান?"

নন্দকুমার উত্তর দিল, "আপনাকে।"

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যতীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে?"

রহস্যজড়িত তরলকণ্ঠে নন্দকুমার বলিল, "হ্যাঁ, আপনাকে। আপনার নাম যতীন্দ্রবাবু?"

"হ্যাঁ; আপনারা কোথা হ'তে আস্‌ছেন?"

"এই কল্‌কাতা থেকেই।"

"আমার নিকট আপনাদের প্রয়োজন?—"

"ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন মশাই? বিনা প্রয়োজনে কি কেউ কারো কাছে আসে? প্রয়োজন পরে বল্‌ছি। আগে আমাদের বস্‌তে বলুন। না, থাক্ আপনাকে আর কষ্ট করে বল্‌তে হবে না, আমরা নিজেরাই বস্‌ছি। তড়িৎ! ব'সে পড় না হে।" এই বলিয়া নন্দকুমার যতীন্দ্রনাথের শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। তড়িৎ শয্যার নিকটস্থ একখানি চেয়ারের উপর বসিল। যতীন্দ্রনাথ বিশেষ লজ্জিত হইল। কোন কথা সে বলিতে পারিল না, একদৃষ্টে নন্দকুমারের দিকে তাকাইয়া রহিল।

নন্দকুমার বসিয়া পড়িয়া যতীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার শরীর আজ কেমন?"

"একটু ভাল। আপনাকে ত চিন্‌তে পাচ্ছিনে। আপনার নামটা জিজ্ঞেস্ কর্‌তে পারি কি?"

"কেন পার্‌বেন না? আমার নাম অতীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।" নন্দকুমার তাহার প্রকৃত নাম বলিলে পাছে তাহাকে যতীন্দ্রনাথ চিনিতে পারে, এইজন্য সে তাহার নাম বলিল অতীন্দ্র। এই নামটি তাহার প্রকৃত নাম না হইলেও অপ্রকৃত নাম নহে। কারণ, এই নামটি তাহার শ্যালিকারা রাখিয়াছিল। তাহার কারণ, তাহার জ্যেষ্ঠ ভায়রার নাম সতীন্দ্র, মধ্যম ভায়রার নাম যতীন্দ্র, সুতরাং তাহার নাম অতীন্দ্র না হইলে মিল খায় না।

যতীন্দ্রনাথ নন্দকুমারের নিবাসস্থান জিজ্ঞাসা করিল। নন্দকুমার উত্তর দিল, "কল্‌কাতায়।"

যতীন্দ্রনাথ আর কোন প্রশ্ন করিল না। তাহাকে নীরব হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, নন্দকুমার বলিল, "আপনার আর কোন প্রশ্ন নেই বোধ হয়; এখন আমি আমার বক্তব্য আরম্ভ করি—আমি আজ ক'দিন হ'ল আপনার শ্বশুরবাড়ীর দেশ থেকে এসেছি। সেখানে আমাদের একঘর কুটুম্ব আছেন। আমি তাঁদের বাটীতেই ছিলাম। আমি কল্‌কাতায় থাকি জেনে, আপনার শাশুড়ীই হবেন বোধ হয়, যাক্ তিনি এসে আমাকে বল্লেন—'বাবা! তুমি ত কল্‌কাতায় থাক, আমার যতীনও কল্‌কাতায় থাকে; শুনেছি তার খুব অসুখ। তার পত্র মোটেই পাইনে। তার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে তাকে পত্র দিতে অবিশ্যি অবিশ্যি বোলো। তার নিজের হাতের লেখা একখানা পত্র আমার কাছে তুমি থেকে লিখিয়ে দিও। মনে থাকে যেন এ কথাটা বাবা! ভুলো না,—আপনি চিঠি পত্র লেখেন না কেন?"

"ঐ একটা আমার প্রকাণ্ড দোষ; চিঠিপত্র লিখ্‌তে আমার বড় আলস্য।"

"তা বল্‌লে ত চল্‌বে না। আপনার অসুখের কথা যখন তাঁরা শুনেছেন,

তখন আপনার পত্র না পেলে কি ক'রে তাঁরা সুস্থির হন? নিন্, লিখুন; পোষ্টকার্ড যদি আপনার কাছে এখন না থাকে তবে আমার কাছে আছে—এই নিন্, লিখুন। আমি যাবার সময় ডাকে দিয়ে যাব। পোষ্টকার্ডের দাম দু'টি পয়সা হয় যাবার সময় দেবেন, না হয় আমি পত্র লিখে আপনার শ্বশুরবাড়ী থেকেও আনিয়ে নিতে পারব।"

"না, পোষ্টকার্ড আমার কাছেই আছে।"

তড়িৎ নন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কার নিকট থেকে পয়সা আনিয়ে নেবে হে?"

"লোক আছে ভাই; তুমি তার বুঝবে কি? এখনও ছেলে ছোক্‌রা মানুষ তোমরা—নিন্ যতীন বাবু, তবে লিখুন।"

"বসুন, ব্যস্ত কি?" এই বলিয়া গলাটা একটু চড়াইয়া দিয়া সে ডাকিল, "ওরে শিবু!"

"হাঁ" বলিয়া উত্তর দিয়া ছাপ্‌রা-নিবাসী কাঠখোট্টা জোয়ান শিবনাথা সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ক্যা বাবু?"

যতীন্দ্রনাথ বাঙ্গলায় বলিল, "এ বিছানায় আর ত শোয়া চলে না রে; কতদিন হ'ল কাপড় কাচ্‌তে দিয়েছিস্, এখনও কি সেগুলি কাচা হয় নি? যাক্, সেগুলি পরে দেখে আসিস্। আগে বাবুদের জন্য কিছু খাবার এনে দে।"

"বহুৎ আচ্ছা" বলিয়া শিবনাথা কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

নন্দকুমার বলিল, "খাবার কেন? খাবার কেন?"

তড়িৎকান্তি বলিল, "খাবার খাওয়ার জন্য—আর কেন? তুমি বোকা, পরিচয়টা যদি দিতে, তবে বেশ পেট-ভ'রে খাওয়া যেত। শ্বশুর-বাড়ীর দেশ থেকে এসেছ শুনেই যখন যতীন বাবু খাবারের বন্দোবস্ত করলেন, তখন তোমার পরিচয়টা পেলে আমি নিশ্চয় বলতে পারি,

বুঝ্‌লে কি না—যতীন বাবু! আমি খাবারের নাম শুনে লোভ সম্বরণ কর্‌তে পাচ্ছিনে। ইনি এখন অপরিচিত হ'লেও পরিচয় নিলেই আপনার বিশেষ পরিচিত হ'য়ে প'ড়বেন। পরিচয়টা নিয়ে আরও কিছু খাবার আন্‌তে দিন্।"

নন্দকুমার বলিল, "তড়িৎ! তুই ভারি লোভী, তোকে নিয়ে আর ভদ্রসমাজে ঘোরা যায় না দেখ্‌ছি।"

"না যায় আমার খুঁটি-মুছি ভাগ ক'রে দেও.—আমি ভিন্ন হ'য়ে যাই।" এই কথায় যতীন্দ্রনাথ হাসিয়া উঠিল।

তড়িৎকান্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তবে আসি যতীন বাবু, আমাকে নিয়ে আমার বন্ধু ভদ্রসমাজে মিশ্‌তে লজ্জিত হন। আপনি ওর পরিচয়টা নিয়ে আরও খাবার আনেত দিন্—আমি যাবার সময় শুনে যাই।"

এই বলিয়া, সে সশব্দে একটা কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তাহাতে যতীন্দ্রনাথ এবং নন্দকুমার উভয়েই হাসিল। তড়িৎ বলিল, "বাঃ যতীন বাবু! আপনিও হাস্‌ছেন,—আমার দুঃখে একটুও সহানুভূতি দেখালেন না? যাক্, সবই আমার ভাগ্য, বন্ধু যখন আমাকে ত্যাগ করেছে, তখন আর কে আমাকে আপনার ব'লে টেনে নেবে! তবে আমি আসি যতীন বাবু।" এই বলিয়া তড়িৎ দরজা পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে যতীন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল, "বসুন, বসুন, রাগ কর্‌বেন না। আপনারা আমার অতিথি।"

"এঁ্যা, অতিথি! বলেন কি যতীনবাবু? তবে এ বেলাটায় না আহার করিয়ে একেবারেই ছাড়্‌বেন না। তা' বেশ, তা' বেশ! তবে আপনার প্রধান অতিথির পরিচয় সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করুন।"

নন্দকুমার বলিল, "অতিথির পরিচয় নিতে নাই।"

"তোমার সঙ্গে কে কথা বল্‌ছে নন্দ? আরে, আরে, থুড়ি; কি যেন কি যেন—হ্যাঁ,—অতীন্দ্র?"

"কি? ওঁর নাম কি ব'ল্লেন?

"ওঁর কাছেই জিজ্ঞেস্ করুন।"

"আপনার নামটা ত কি ব'লেছিলেন?"

"অতীন্দ্রনাথ।"

তড়িৎকান্তি বলিল, "পরিচয়টা, পরিচয়টা।"

যতীন্দ্রনাথ বলিল, "আপনার পিতার নাম জিজ্ঞেস্ করতে পারি কি?"

"কেন মশাই, এত খোঁজ-খবরে? বাড়ীতে সিঁধ্ দেবেন নাকি?"

তড়িৎ বলিল, "এই অসুস্থ অবস্থায় সিঁধ্ কাট্‌তে যাবেন কি ক'রে? আর যদি যানই, ভদ্রলোকের ছেলে, সখ হ'য়েছে—একটু সিঁধ দিলেনই বা।" এই বলিয়া সে নন্দকুমারের প্রকৃত পরিচয় দিল। যতীন্দ্রনাথ নিজ ভায়রাকে দেখিয়া রোগশয্যায় বিশেষ শান্তি এবং তৃপ্তিলাভ করিল। তাহার পর যতীন্দ্রনাথ প্রাণের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া নন্দকুমারের সহিত কত কথা কহিতে লাগিল,—বড় আপনার লোকের মত—বড় বাঞ্ছিত-জনের মত

শিবনাথা খাবার লইয়া আসিল। যতীন্দ্রনাথ বলিল, "এ খাবারে কি হ'বে? আরও নিয়ে আয়।"

শিবনাথা বিস্মিতকণ্ঠে কহিল, "আউর আনেগা?"

যতীন্দ্রনাথ বলিল, "হ্যাঁ, আর পান সিগারেট্ এনেছিস্ কৈ?"

"লেয়াতা হ্যায়" বলিয়া শিবনাথা প্রস্থান করিল।

নন্দকুমার বলিল, "আর কেন মিছি-মিছি—"

তড়িৎ বলিল, "একে তুমি মিছি-মিছি বল? আমি আগেই ব'লেছিলাম

পরিচয়টা দিতে—তা'হলে চাকর বেটার আর দু'বার ক'রে বাজারে যেতে হ'ত না।"

যতীন্দ্রনাথ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "আর কেন লজ্জা দিচ্ছেন?"

আবার খাবার আসিল। খুব হাসাহাসির মধ্যে খাবার নিঃশেষ হইতে লাগিল। যতীন্দ্র রোগের জ্বালা ভুলিয়া শান্তির হাসি হাসিল। জলযোগ শেষ হইল। নানারূপ কথা আরম্ভ হইল। কথার মাঝে যতীন্দ্রকে একবার কাশিতে দেখিয়া এবং কাশির আওয়াজ শুনিয়া, তড়িৎ জিজ্ঞাসা করিল, "যতীন বাবু! চিকিৎসা কে কর্‌ছেন?"

"কাল থেকে শ্যামাদাস বাবু চিকিৎসা কর্‌ছেন।"

"এর পূর্ব্বে কি ডাক্তারী-চিকিৎসা চ'ল্‌ত?"

"হ্যাঁ।"

"কি রোগ তাঁরা ব'লেছিলেন?"

"রোগের কথা ত কিছুই বলেন নি।"

"থাক্‌, চেঞ্জে যেতে কেউ বলেন নি?"

"বলেছিলেন, কিন্তু বাবা কবিরাজী চিকিৎসার কথা বল্লেন।"

"কবিরাজ কি বলেন?"

"পনর দিন তাঁর ওষুধ খেতে হবে,—তারপর তিনি আবার আমাকে দেখে যা' হয় একটা ব্যবস্থা কর্‌বেন।"

"তা' বেশ।" এইরূপ অনেক কথার পর নন্দকুমার পর-দিনও আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়া যতীন্দ্রের নিকট হইতে তাহার স্বহস্ত-লিখিত একখানা পত্র লইয়া 'নমস্কার' বলিয়া বিদায় লইল। তড়িৎকান্তিও বিদায় লইয়া নন্দকুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিরে আসিল।

রাস্তায় আসিয়া তড়িৎ বলিল, "কি রোগ হ'য়েছে বুঝেছিস্‌ নন্দ?"

নন্দ সহজভাবে বলিল, "ম্যালেরিয়া।"

"না, তোর যে ভীষণ রোগ হ'য়েছিল ।"

"কি,—থাইসিস্ ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তোর প্রথম অবস্থাতেই ধরা প'ড়েছিল, তাই তুই রেহাই পেয়েছিস্, কিন্তু—"

তড়িৎ কথা সম্পূর্ণ করিল না।

ভীতকণ্ঠে নন্দকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু কি ?"

"এ রোগ হ'য়েছে অনেক দিন।"

"তুই কি ক'রে বুঝ্‌লি ?"

"কাশির আওয়াজ শুনে। এরা কিন্তু এখনও বোঝেনি যে, এ থাইসিস্।"

"দেখে কি রকম বুঝ্‌লি ?"

"হোপ্‌লেস্, আশা নেই। অনেক দিন হ'য়ে গিয়েছে।"

নন্দকুমার কেমনই একটা অস্বাভাবিক-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন উপায় ?"

"উপায় একমাত্র ভগবান।"

নন্দকুমার আর কোন কথা বলিল না; কেমনই একটা ঘন বেদনার অন্ধকার হৃদয়ের মধ্যে চাপিয়া বাসায় ফিরিল।

৬

পরদিন নির্দ্দিষ্ট-সময়ে নন্দকুমার যতীন্দ্রনাথের মেসে গিয়া শুনিল যে, যতীন্দ্রনাথ পরদিন বাটী যাইবে। অনেক কথার পর নন্দকুমার তাহার নিকট হইতে সেই দিনের জন্য বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে রওনা হইল।

তাহার পরদিন নন্দকুমার যথা-সময়ে আসিয়া যতীন্দ্রকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিল।

যতীন্দ্রনাথ বাটী পঁহুছিল। চামেলীর মুখে হাসি ফুটিল; কিন্তু প্রাণের এক কোণে কেমনই একটু অশান্তির আঁধার রহিয়া গেল, কারণ তাহার স্বামী অসুস্থ।

বিরহের পর মিলনে বড় আনন্দ। সে আনন্দ জলপ্লাবনের মত শাসন মানিতে চাহে না,—সে আনন্দ ভরা ভাদ্রের নদীর মত উছলিয়া পড়িতে থাকে,—সে আনন্দ ঝটিকার মত উদ্দাম-গতিতে ছুটিতে থাকে। প্রিয়জনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আনন্দ হইবে না? বাঞ্ছিত জনের দর্শন যে জীবনের অতীত দুঃখ কষ্টকে চিরতরে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে ডুবাইয়া দিয়া প্রাণের মাঝে শান্তির প্রস্রবণ ছুটাইয়া দেয়!

যতীন্দ্রনাথ প্রায় দুই সপ্তাহ বাটীতে থাকিয়া আবার কলিকাতায় যাইয়া কবিরাজ দেখাইল। কবিরাজ তাহাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাইতে উপদেশ দিলেন। সে কবিরাজের উপদেশ তাহার পিতাকে জানাইতে পুনরায় বাটী গেল। বাটী গিয়া নিজেকে দিন দিন কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ অনুভব করিতে লাগিল। সুতরাং হাওয়া পরিবর্ত্তনে যাইবার আয়োজন বন্ধ রহিল।

দুই সপ্তাহ বেশ ভাল থাকিবার পর যতীন্দ্রনাথের আবার জ্বর হইল, কাশি বাড়িল। বাটীর সকলে চিন্তিত হইল। চামেলী নির্জ্জনে বসিয়া নীরবে অনেক কাঁদিল। অশ্রুসিক্ত-নয়নে প্রাণপণে স্বামীর সেবা করিল। ভগবানকে কত ডাকিল, কত প্রার্থনা করিল।

তিন দিন পরে তাহার জ্বর বিচ্ছেদ হইল। চামেলী দেবতাস্থানে ভোগ দিল। হাওয়া পরিবর্ত্তনে যাইবার দিন স্থির হইল। চামেলীরও যাইবার কথা হইল। অবশেষে তাহার যাওয়া হইল না। প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধেরা নিষেধ করিলেন, বলিলেন,—"এমন অসুখে যুবতী ভার্য্যা নিকটে থাকা অনুচিত।"

হাওয়া পরিবর্ত্তনে যাইবার পূর্ব্বদিন রাত্রে যতীন্দ্রনাথ শয্যার উপর অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল। পার্শ্বে চামেলী শুইয়া পড়িয়া অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করিতেছিল; এবং মধ্যে মধ্যে বুকফাটা উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাসে চতুঃপার্শ্বের স্থির বাতাসকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল।

পাতলা ঘুমে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া চামেলীর তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসের স্পর্শনে যতীন্দ্রনাথের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বুঝিল, চামেলী কাঁদিতেছে। চামেলীকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহারও চক্ষে জল আসিল।

চামেলী কাঁদিতেছিল,—স্বামীর রোগ-ক্লিষ্ট মলিন মুখ দেখিয়া। যতীন্দ্রনাথ কাঁদিল,—স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না বলিয়া। যতীন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ নীরবে কাঁদিয়া, নিজ চক্ষুর জল মুছিয়া কোমলকণ্ঠে চামেলীকে বলিল, "মেলি! কাঁদ্‌ছ?"

চামেলী কথা কহিল না। তেমনি ভাবে কাঁদিতে লাগিল। যতীন্দ্র চামেলীর চক্ষুদ্বয় নিজ বসনাঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া দিয়া স্নেহবিজড়িত-কণ্ঠে কহিল,—"কেঁদো না মেলী। তোমার চক্ষে জল দেখ্‌লে যে, আমারও কান্না পায়।"

এই কথা শুনিয়া চামেলীর ক্রন্দনের বেগ আরও বর্দ্ধিত হইল। যতীন্দ্র আবার তাহার অশ্রু মুছাইয়া কহিল, "কেঁদো না, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর,—শীঘ্রই রোগ মুক্ত হ'য়ে আবার তোমার বক্ষে ফিরে আসতে পারি।"

চামেলী কোন কথা কহিল না। কেবল কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয়ের গাঢ় বেদনা লাঘবের বৃথা প্রয়াস পাইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল,—স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করিবারও তাহার কোন অধিকার নাই?

যথাসময়ে হাওয়া পরিবর্ত্তনে যতীন্দ্রনাথ মাতাসহ মধুপুর আসিল।

কিছুদিন মধুপুর থাকিয়া রোগের কোন উপকার না দেখিয়া আবার বাটী ফিরিল। বিরহের পর মিলন হইল। কিন্তু চামেলীর প্রাণে একবিন্দুও শান্তি আসিল না। অশান্তির ভার বৃদ্ধি হইল মাত্র। সে মিলনরাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী ছিল। শরতের জ্যোৎস্না দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মাতৃস্নেহের মত চন্দ্রমা তাহার স্নিগ্ধ, শুভ্র, জ্যোৎস্নারাশি দুই হাতে বিলাইয়া দিতেছে। এমন জ্যোৎস্নার মাধুরী দেখিয়া চামেলী এবং যতীন্দ্র উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কত বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত করিয়াছে,—কিন্তু আজ? আজ তাহাদের মধ্যে একজন রোগক্লিষ্ট মলিন-মুখে নিদ্রা যাইতেছে,—অন্যজন অশ্রুজলে বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত করিতেছে। আজ ত মিলনের প্রথম রাত্রি! ভবিষ্যৎ বিরহের শেষ মিলন রাত্রিতে নয়? আজও ত রজনী তেমনি জ্যোৎস্নাময়ী,—তেমনি হাসিহাসি,—তেমনি মধুর—তেমনি পুলকিত,—তেমনি শান্ত,—তেমনি সুন্দর!

পিউ-পিউ-স্বরে পাপিয়া ডাকিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিতেছে,—কিন্তু চামেলীর নিকট এ স্বর বড় কর্কশ,—বড় বেসুরো বোধ হইতেছে। শুভ্র শেফালীপুষ্প বৃক্ষ ভরিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া অমিতব্যয়ীর মত আপনার সৌরভ-ভাণ্ডারদ্বার খুলিয়া দিয়াছে; সে পবিত্র সুগন্ধ চামেলীর নিকট বড় অপবিত্র বোধ হইতেছে। প্রথম মিলনরাত্রি কি নিরানন্দের অশ্রুজলে ব্যয়িত হয়? কিন্তু চামেলীর তাহাই হইল। চামেলী কাঁদিল, সারারাত্রি কাঁদিল। কেহ তাহার এই আকুল ক্রন্দন শুনিল না। সে একমনে কাঁদিল। তাহার এই আত্মহারা ক্রন্দন ভগবান শুনিলেন কি না, বলা যায় না।

শরৎকাল। চারিদিকে আনন্দ। চারিদিকে হাসি। মাঠে মাঠে সুপক্ব ধান্যের সুগন্ধ। বনে বনে নানাজাতীয় পুষ্পের মিলিত সৌরভ। বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষিগণের সুমিষ্ট কলরব। নির্ম্মল নির্মেঘ নীলাকাশের

চাঁদিমার ভুবন-ভোলান হাসি। বহুদিনের পর স্বামীর আগমনে যুবতী ভার্য্যা যেমন সুসজ্জিত হয়, পৃথিবীও ঠিক তেমনিভাবে সুসজ্জিত হইয়াছে।

শারদীয়-পূজা আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিকে ঢাক-ঢোল বাজিতেছে—চারিদিকে আনন্দের কেবল হল্লা হইতেছে। আনন্দ হইবে না? আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দ হইবে না? মা' যে আনন্দ ছাড়া আর কিছুই জানেন না। তাই মায়ের নাম আনন্দময়ী! মায়ের আগমনে সারাটি বিশ্ব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। ঐ নদী রোমাঞ্চিত হইয়া কলস্বরে গান গাহিয়া চলিয়াছে—ঐ বিহঙ্গকুল আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতেছে। মা' যে আনন্দময়ী! আনন্দই তাঁহার রাজ্য—আনন্দই তাঁহার বিধান—আনন্দই তাঁহার দান!

যতীন্দ্রনাথের বাটীতে পূজা। মহা ধূমধাম। পূজা আরম্ভ হইয়াছে। কত লোক অনাহারে বদ্ধপরিকর হইয়া খাটিতেছে। কত লোক ফাঁকে ফাঁকে বেড়াইতেছে। কত লোক বাবুর সম্মুখে অতি পরিশ্রমের কার্য্য দেখাইয়া বাহবা লইতেছে। কত লোক খাইতেছে। কত লোক অতিরিক্ত আহারে অথবা পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। চামেলীর সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। সে আহার বিহার ভুলিয়া দিবা-নিশ মায়ের চরণতলে পড়িয়া রহিয়াছে। কত প্রার্থনা করিতেছে। কত কাঁদিতেছে। কত ডাকিতেছে। মনে মনে বলিতেছে—"মা! তুমি যে আনন্দ ছাড়া জান না! তবে আমায় কেন নিরানন্দ ক'রে রেখেছ মা! তোমার অসীম অনন্ত শুভ্র করুণা ব্যতীত মানুষ কি বাঁচে মা! মা কি সন্তানের উপর রাগ করিতে পারে মা! মা যদি রোষরক্তিম কটাক্ষে তার সন্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করে—তবে যে মা ভূমিকম্পে শতাব্দির রচনা ভূমিস্যাৎ হইবার মত সে ধ্বংস হইয়া যায় মা! মায়ের অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ,

যা' ব্যতীত মানব উন্নত হ'তে পারে না, তা' কি সন্তানের উপর বর্ষিত হ'তে দ্বিধা করে মা? মায়ের স্নেহ যা' নির্মেঘ আকাশের প্রভাত প্রদ্যোতের মত সুন্দর; যা' শরৎ শশির মত শুভ্র—উদার—মধুর, যা' সমুদ্রের অপেক্ষাও অতল অপার, যা' আকাশ অপেক্ষাও অনন্ত—অসীম—তার উত্তরাধিকারী সন্তানই ত মা! আমিও ত তোমার সন্তান! আমাকে তোমার একবিন্দু করুণা দেও মা! মায়ের করুণা-দ্বার কি সন্তানের নিকটে রুদ্ধ হ'তে পারে মা? মা! মা! তোমার একবিন্দু করুণা—একবিন্দু স্নেহ—একবিন্দু আশীর্ব্বাদ—আমার স্বামীকে ভিক্ষা দেও মা! যদি কোন অপরাধ তিনি তোমার চরণে ক'রে থাকেন, তবে তাঁকে ক্ষমা কর মা! তাঁকে ক্ষমা ক'রে, তাঁর প্রাপ্য শাস্তি আমাকে দেও মা! সন্তানের উপর কি মায়ের ক্রোধ হ'তে পারে মা? সন্তানের অপরাধ কি মা ধরে মা? মা! আমার স্বামীকে নিরোগ ক'রে দেও! আমি তোমার সৌম্য শান্ত সুন্দর মূর্ত্তি গড়িয়ে, এই বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে সন্ত উষ্ণ লোহিত রক্ত দিয়ে তোমার ও দু'টি চরণ আরও রাঙ্গা ক'রে দেব মা!"

৭

বাটীতে থাকিয়া ব্যাধির কোন উপশম হইল না, বরং বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পুনরায় বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাওয়া স্থির হইল। দিন স্থির হইল না। পুরীতে পাণ্ডার নিকট বাসা ঠিক করিতে 'তার' করা হইল।

সেদিনের রাত্রিতে শশধর সুন্দর হাসির মাধুরী ছড়াইয়া পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করিতেছিল। পড়ি পড়ি শীতের নাতি-ঠাণ্ডা বাতাস সমস্ত পৃথিবীকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। হঠাৎ চাঁদের হাসি শুকাইল। আকাশ-প্রান্তে মেঘ দেখা দিল। সে মেঘখানি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে

পাইতে সুধাকরকে এবং সমস্ত নভোমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিয়া ভীষণ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়া ফেলিল।

রোগের জ্বালা একটু কম ছিল। তাই যতীন্দ্র সেদিন বেশ একটু শান্তি অনুভব করিতেছিল।

রাত্রি তখন অনেক। যতীন্দ্র এবং চামেলী জাগিয়া অনেক অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা কহিতেছিল। যতীন্দ্র চামেলীকে কহিল, "মেলি! একটা গান গাওনা, অনেকদিন তোমার গান শুনি নাই।"

মেঘ মৃদুস্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বৃষ্টি আরম্ভ হইল—প্রথমে ধীরে ধীরে—পরে সশব্দে—তারপরে জোরে।

চামেলীর কণ্ঠস্বর ছিল মধুর। স্মরণশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ। যে কোন গান একবার শুনিলে, তাহার পদগুলি এবং সুর সে অবিকল আয়ত্ত করিতে পারিত। বিবাহের পূর্ব্বে সে মাঝে মাঝে মুক্তকণ্ঠে গাহিত। বিবাহের পর পিত্রালয়ে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিত। গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে গাহিতে হঠাৎ তাহার কণ্ঠ চড়িয়া যাইত। কিন্তু শ্বশুরালয়ে কোন দিন সে গুন্ গুন্ করিয়াও গাহিত না।

যতীন্দ্র জানিত—চামেলী গাহিতে পারে। মাঝে মাঝে সে অনুরোধ করিলে, চামেলী নীরব নিশীথে তাহার সম্মুখে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিত।

সেদিন যতীন্দ্রের হাসিমুখ দেখিয়া চামেলী বেশ একটু শান্তি পাইতেছিল। স্বামীর আদেশ পাইবামাত্র সে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল। যতীন্দ্র বলিল, "গলা ছেড়ে দিয়ে গাও। একে মানুষের সাড়াশব্দ নেই, তার ওপর আবার এই ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির শব্দ। তুমি গলা ছেড়ে দিয়ে গাইলে কেউ শুনতে পাবে না।"

চামেলী কণ্ঠস্বর চড়াইয়া দিয়া গাহিল—

তুমি কোন কাননে লুকিয়ে ছিলে,
জ্যোৎস্না রাতে দেখা দিলে,
প্রাণটি আমার কেড়ে নিলে,
ওগো আমার বর !

তোমার তরে দিবানিশি,
এখন আমি কাঁদি হাসি,
সকল সময় ভালবাসি,
ওগো গুণধর !

আপন তুমি ভুলাইলে,
পরকে তুমি চিনাইলে,
হৃদয়খানি কিনে নিলে,
ওগো প্রাণেশ্বর !

আমার এই হৃদয়-মাঝে
ব'স তুমি দেব-সাজে ;
বিরহ তোমার প্রাণে বাজে,
কত লাগে ডর ;
ওগো আমার বর !!

গান থামিল। যতীন্দ্র বলিল, "ঐ গানটা গাওত।"

চামেলী জিজ্ঞাসা করিল, "কোন গানটি ?"

যতীন্দ্র বলিল, "কেন তারে কালো বল !"

বৃষ্টি অবিশ্রান্তভাবে তেমনি সশব্দে পড়িতেছিল। চামেলী মুক্তকণ্ঠে গাহিল—

কেন তারে কালো বল ?
সে ত আমার নয় ত কালো,

আমার আঁধার প্রাণের উজল-আলো,
আমি তারে বাসি ভালো,
সে যে, আমার জীবন-তরির নেয়ে।
যদি তারে কালো দেখ,
আবার তারে চেয়ে দেখ—
নিয়ে আমার চোখ দু'টি॥
আমার পরাণখানা হারিয়ে ফেলে,
নিয়েছি তারে বক্ষে তুলে,
ঐ চরণে বিকিয়ে দিছি, আমার জীবনটি।
আমার বল্‌তে যা' কিছু ছিল—
সবই ফেলেছি তারে দিয়ে।
সে যে, আমার জীবন-তরির নেয়ে।

গান শেষ হইল। যতীন্দ্র বলিল, "কি সুন্দর তোমার কণ্ঠ!—আমার রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়! আমাকে যেন কোন এক অজানা দেশে নিয়ে চ'লে যায়! শুনেছি, মৃত্যুযন্ত্রণা বড় ভীষণ। কিন্তু তোমার ঐ কণ্ঠের ঝঙ্কারের মাঝে যদি আমার মরণ হয়, তবে আমি কোন জ্বালা, কোন যন্ত্রণা অনুভব কর্‌তে পাব না—তেমন মরণ কার না ঈপ্সিত!"

চামেলী রুক্ষ-কণ্ঠে কহিল, "যাঃও, ওকি কথা?"

যতীন্দ্র তেমনি সহজ সরল কণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল, "তোমায় বিয়ে ক'রে সত্যই আমি বাঁদর হ'য়ে মুক্তার হার গলায় প'রেছি।" নাতিদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আবার বলিল, "বনমধ্যে কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে শুকিয়ে যায়! কেউ তা' দেখে না—"

চামেলী তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, "রাত অনেক হ'য়েছে। অসুস্থ শরীর—আর রাত জেগো না। শুয়ে পড়।

বৃষ্টি থামিল। যতীন্দ্র শুইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। প্রদীপে তৈল ছিল

না। প্রদীপ নিভিল। চামেলী দেখিল—অন্ধকার—অনন্ত অন্ধকার—সূচীভেদ্য অন্ধকার—প্রলয়ের গাঢ় অন্ধকার! তাহার কেমনই যেন ভয় করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল—স্বামীর বক্ষে মাথা লুকাইয়া নিদ্রা যায়। কিন্তু স্বামীর গাত্র স্পর্শ করিল না। ভাবিল—যদি তিনি ঘুমাইয়া থাকেন, তবে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। ঘুম ভাঙ্গিলে অসুস্থ শরীর আরও অসুস্থ হইতে পারে। চামেলী তাহাকে ডাকিল না। স্বামীর বক্ষে মাথা লুকাইল না। একাকী সেই ঘনতমসাবৃতঃকক্ষে ভীতিবিহ্বল অন্তঃকরণে জাগিয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়া পড়িল। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখিল—অনন্ত অন্ধকার! যে দিকে চাহিল, দেখিল—অসীম অন্ধকার। অনেক সময় অপেক্ষা করিল, কিন্তু অন্ধকার ফুরাইল না। ঘরে অন্ধকার, বাহিরে অন্ধকার। সেই অফুরন্ত গভীর অন্ধকারপূর্ণ রাজ্যে সে একা, বড় একা, বাহিরে কেউ নাই,—আপনার বলিতে কেউ নাই। সেই অদ্ভুত অন্ধকার-মধ্যে সে দেখিল—একটি বিকট কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসীমূর্ত্তি তাহার বিরাট বদন ব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। চামেলী সত্যই ভীতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। কেহ সাড়া দিল না। চামেলী দেখিল—অন্ধকার—ভীষণ অন্ধকার—বীভৎস অন্ধকার!

৮

পরদিন প্রভাতে পুরীধামের পাণ্ডার নিকট হইতে 'তার' আসিল—বাসা ভাড়া করা হইয়াছে।

সে দিনটি ভাল ছিল। দুই চারি দিনের মধ্যে শুভদিন আর ছিল না। কাজেই যতীন্দ্রনাথের পিতা সেই দিনই তাহাকে পুরীধামে রওনা করাইবার দিন স্থির করিলেন। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাহার মাতা, ভ্রাতা এবং একজন পুরাতন ভৃত্য যাইবে স্থির হইল। তাহারা রওনা হইবার সময়

যতীন্দ্র চামেলীর সহিত দেখা করিতে আসিয়া দেখিল—চামেলী শয্যার উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। তাহা দেখিয়া সেও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। দুই ফোঁটা তপ্ত লবণাক্ত অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া মাটিতে পড়িল। তাহার পর চক্ষু মুছিয়া শয্যার উপর গিয়া চামেলীকে দুই বাহুর দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার রক্তিম অধর আরও রক্তিম করিয়া বলিল, "কেঁদো না চামেলী, আমি বাবা জগন্নাথের প্রসাদে শীঘ্রই রোগমুক্ত হ'য়ে তোমার কাছে ফিরে আস্‌ব। তুমি ভগবানকে ডেকো। মাঝে মাঝে আমার কাছে পত্র দিও। তোমার পত্র না পেলে আমি বড় উদ্বিগ্ন হব।"

চামেলী কোন কথা কহিল না। যতীন্দ্রের বড় ইচ্ছা ছিল যে, সে সস্ত্রীক পুরীতে যায়। কিন্তু বৃদ্ধদের কাহারো মত ছিল না। তাহার সম্পূর্ণ মত থাকিলেও সে সরমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সে কথা প্রকাশ করিতে পারিল না।

চামেলীর ঢল ঢল চক্ষু দুইটি দিয়া অবিশ্রান্ত জল পড়িতে লাগিল। যতীন্দ্র তাহা দেখিয়া কহিল, "কেঁদো না চামেলী। এখন যে আমি যাত্রা কর্‌ছি! এখন কাঁদ্‌লে যে আমার অকল্যাণ হবে! প্রথম বিচ্ছেদের পর মিলনের প্রথম রাত্রে যেমন ভাবে ঐ ঢল ঢল চোখে চেয়েছিলে, আজ তেম্‌নি ভাবে মনভোলান চাহনি চাও! সে রাত্রে যেমন ভাবে ঐ মুক্তার মত দন্ত বিকশিত ক'রে রক্তিম অধরে হেসেছিলে, আজ তেম্‌নি ভাবে মনোমুগ্ধকর হাসি হেসে দিব্য-স্ত্রী সেজে বামে দাঁড়িয়ে আমায় কিছু দিনের জন্য বিদায় দেও।"

চামেলী শয্যাত্যাগ করিল। আঁখিযুগল মুছিল। বামে আসিয়া দাঁড়াইল। ঢল ঢল চক্ষুদ্বয় দ্বারা চাহিল, কিন্তু হাসিতে পারিল না।

যতীন্দ্রনাথ কহিল, "তবে আমি আসি চামেলী!"

চামেলী কথা কহিতে পারিল না; ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল এবং স্বামীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া, নতমুখে তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। যতীন্দ্র তাহার সুন্দর মুখখানি ধরিয়া উঁচু করিয়া অধরে অধর লাগাইয়া পাল্কীতে উঠিল। যতক্ষণ পাল্কী দৃষ্টিপথের মধ্যে ছিল—ততক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর ঝর্ ঝর্ করিয়া আবার তাহার চোখের জল পড়িতে লাগিল। কাঁদিল, সে কাঁদিল, অনেক কাঁদিল, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু ফুলাইল; রক্তবর্ণ করিল। তবুও ত' আশা মিটিল না। কাঁদিয়া ত' আশা মিটিল না।

৯

যতীন্দ্রনাথ পুরীতে যাইবার কয়েকদিন পরে চন্দ্রনাথ বাবু চামেলীকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। চামেলী যতীন্দ্রের নিকট তাহার পিত্রালয়ে আসিবার কথা এবং পত্র পাঠ মাত্র তাহার সুস্থ সংবাদ দিবার কথা লিখিল।

যতীন্দ্র যথা-সময়ে পত্র পাইয়া তাহার উত্তর দিল। সে পত্রে তাহার শরীর অনেক সুস্থ হইয়াছে এবং শীঘ্রই জগন্নাথের কৃপায় রোগমুক্ত হইবে, এই কথা লেখা ছিল। চামেলী সে পত্র পড়িয়া বিশেষ শান্তি পাইল। চামেলী জানিত না যে, তাহার স্বামীর শরীরে কি উৎকট ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। যাহা হউক, সে যতীন্দ্রের পত্রোত্তর দিল। তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লিখিল—প্রত্যহই তাহার নিকট তাহার শারীরিক কুশল সংবাদ দিতে। তাহার পত্র প্রত্যহ না পাইলে, সে বিশেষ উথলা হইবে, এ কথাও সে লিখিতে ভুলিল না।

এই পত্রের উত্তর আসিল—সে প্রায় সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছে। শরীরে পূর্ব্বের মত বল হয় নাই। শরীরে বেশ একটু শক্তি সামর্থ হইলেই

মে বাটী যাইবে। এখন সে প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় সমুদ্রের বেলাভূমির উপর দিয়া অনেক পথ হাঁটিয়া বেড়ায়।

এই পত্র পাইয়া চামেলীর হৃদয় শান্তিতে পরিপূর্ণ হইল। সে এই পত্রের উত্তর দিয়া বাজার হইতে বাতাসা আনাইয়া—ছোট ছেলেমেয়েদের সন্ধ্যার সময় ডাকাইয়া আনিয়া হরির গান গাহিতে বলিল। তাহারা গাহিল—

হরি হরি বল।

বল হরি বল॥

যা'র বাড়ী হরিলুট তা'র বাড়ী মঙ্গল॥

এই তিনটি লাইন তাহারা সুর করিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল। চামেলী মধ্যে মধ্যে তাহাদের গায়ের উপর স্বামীর মঙ্গলার্থে বাতাসা ছড়াইয়া দিতে লাগিল। ছোট ছোট বালক-বালিকার দল তাহা কুড়াইতে কত আছাড় খাইল—গান বেসুরো করিয়া আবার সুস্বরে ধরিল। তিন বার ছড়াইবার পর চামেলী প্রত্যেক বালকবালিকার হস্তে এক এক মুষ্টি বাতাসা বিতরণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ তিন চারি বার করিয়া লইল। মিথ্যা কথা বলিয়া কেহই লইল না। সত্য কথা বলিয়াই লইল।—প্রথমবার বলিল, "আমার নিজের।" দ্বিতীয়বার বলিল, "আমার ছোট ভায়ের।" তৃতীয়বার বলিল, "আমার দিদির।" চতুর্থবার বলিল, "আমার মায়ের।"

চামেলী বালকবালিকার সরলতা, উদারতা এবং আপনার জনের জন্য এত ভালবাসা এত টান দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সন্তুষ্ট হইয়া মুষ্টি ভরিয়া বাতাসা দিয়া তাহাদের বিদায় দিয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। এতদিন পরে আজ তাহার অধরে আবার হাসি দেখা দিল, মুখে কথা ফুটিল, সকলের সহিত হাসিয়া খেলিয়া প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে লাগিল।

দিন কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। কারণ, সে মানুষের মত অলস নয়। সে আপন মনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাইবে, আবার আসিবে।

যতীন্দ্রনাথের পত্র আসিবার দিন আসিল; কিন্তু পত্র আসিল না। চামেলী দুইদিন পত্রের অপেক্ষায় ছটফট্ করিয়া আর একখানা পত্র দিল। যতীন্দ্র চামেলীর শেষের পত্রখানা পাইল; কিন্তু ইতিপূর্ব্বের পত্রখানা পাইয়াছিল না। চামেলীর পত্র না পাইয়া সে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবুর পত্র পাইয়া তাহাদের বাটীস্থ সকলের মঙ্গল জানিয়া ভাবিল—চামেলী কোন কার্য্যবশতঃ পত্র দিতে পারে নাই। দুই চারিদিন পরে নিশ্চয়ই পত্র আসিবে। যথাসময়ে চামেলীর শেষপত্র যাইয়া যতীন্দ্রের হাতে পঁহুছিল। যতীন্দ্র সে পত্রের উত্তর দিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে পত্র চামেলীর হস্তগত হইল না। পিওন বোধ হয় কোন বালকের নিকট সে পত্র দিয়াছিল। স্বভাবসুলভ চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া বালক হয়ত কোথাও পত্রখানা রাখিয়া মদোন্মত্ত মাতঙ্গীর মত ক্রীড়ায় মাতিয়াছিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে মায়ের কথা মনে পড়ায়, দ্রুত মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিল। পত্রের কথা বালক একেবারেই ভুলিয়া গেল। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া যখন সে ঘুমাইতে গেল, তখন বোধ হয় পত্রের কথা মনে পড়িয়াছিল; কিন্তু তখন রাত্রির অন্ধকারে একা একা যাইতে ভয় হইল। কাহাকেও কিছু বলিল না। বলিলে সে যদি তিরস্কার করে! ভাবিল—পরদিন প্রভাতে যাইয়া পত্র লইয়া আসিবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিল—পত্রের বিষয়। পত্র পাওয়া যায় নাই। তজ্জন্য সকলে তাহাকে প্রহার করিতেছে।

স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিল; আর ঘুম আসিল না। অবশিষ্ট রাত্রিটুকু সে জাগ্রত অবস্থায় অতিবাহিত করিল। প্রভাত হইল। সকলের আগে

শয্যাত্যাগ করিয়া ঝটিকার মত দ্রুত দৌড়াইয়া ক্রীড়াস্থলে আসিল। সে দেখিল—পত্র নাই। দুঃখ-বিজড়িত চিন্তিত-অন্তঃকরণে সে বাটী ফিরিল। পত্রের কথা কাহাকেও বলিল না—বোধ হয় প্রহারের ভয়ে।

চামেলী পত্র পাইল না। যতীন্দ্রনাথের পত্রের জন্য চামেলী ঘূর্ণ্যমান বায়ুর মত চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে লাগিল। কয়েক দিন পরে চন্দ্রনাথ বাবুর নিকট যতীন্দ্রের পত্র আসিল। তাহাতে চামেলী জানিল যে, তাহার স্বামী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছেন। শরীরে শক্তি হইয়াছে, আরও দুই চারিদিন থাকিয়া তিনি বাটী ফিরিবেন।

চামেলী পত্র পড়িয়া আশ্বস্ত হইল। কিন্তু স্বামীর প্রতি অভিমান করিল, মনে মনে ভাবিল—স্বামী তাহাকে পত্র দিলেন না, সুতরাং সেও তাঁহাকে পত্র দিবে না। তাহার পত্রের উত্তর দিতে যখন তাহার স্বামী ইচ্ছা করেন না, অথবা ঘৃণা করেন, তখন সে কেন পত্র দিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিবে? সে পত্র দিল না—আর পত্র দিল না।

চামেলী বড় অভিমানিনী—চির-অভিমানিনী। কথায় কথায় তাহার অভিমান। পিতামাতা ভ্রাতা ভগ্নীর উপর যখন সে অভিমান অভিনয় করিতে পারে, তখন স্বামীর উপর কেন সে অভিমান করিতে পারিবে না? স্বামীর উপরই ত স্ত্রীর অভিমান সুন্দর শোভা পায়। স্বামীর উপর অভিমান অভিনয় করিতে স্ত্রীই একমাত্র অধিকারিণী।

কিছুদিন অতিবাহিত হইল। যতীন্দ্র চামেলীর পত্র না পাইয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া একখানি পত্র দিল। তাহাতে লেখা ছিল—

"প্রাণের মেলি!

তোমার পত্র পাচ্ছিনা কেন? তুমি কি জান না যে, তোমার অদর্শন আমার কাছে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা। এ যে কঠিন রোগ-যন্ত্রণা হ'তেও বেশী। কি গুরুতর অপরাধ ভগবানের শ্রীচরণে করেছি জানি না, যার জন্য

তোমার বিরহ আমায় এতদিন ধ'রে সইতে হ'চ্ছে! পত্রপাঠ পত্র দিও। তোমার পত্র না পেলে যে, আমার বুকে বড় ব্যথা লাগে।

"আমি ভাল আছি। আশা করি, তুমিও ভাল আছ। আর দু'সপ্তাহ পরে বাড়ী যাব। যাবার পথে তোমাকে সঙ্গে ক'রে বাড়ী যাব। ইতি"

"তোমারই যতীন্দ্রনাথ।"

যথাসময়ে চামেলী এই পত্র পাইল। পত্র পাইয়া প্রাণে পূর্ণ শান্তি পাইল। কিন্তু অভিমান গেল না। ভাবিল—শ্রীকৃষ্ণের মত যতীন্দ্রনাথ আসিয়া তাহাকে সাধিবে—অপরাধ স্বীকার করিবে—তবে সে অভিমান ত্যাগ করিবে—কথা কহিবে।

তাহার পর সে ভাবিতে লাগিল—ভবিষ্যৎ মানভঞ্জনের কথা। কেমন করিয়া সে শয্যার উপর শুইয়া পড়িয়া থাকিবে! প্রাণান্তেও স্বামীর সহিত কথা কহিবে না। মুখখানা গম্ভীর করিয়া রাখিবে। স্বামী কত সাধিবে—সে ভ্রূক্ষেপ করিবে না। স্বামী কত কথা কহিবে—সে উত্তর দিবে না! স্বামী হাত ধরিয়া কত মৃদু ঝাঁকা দিয়া বলিবে, "চামেলি! কথা কও!"—সে অমনি "যাঃও" বলিয়া তাহার হস্ত সরাইয়া আনিবে! স্বামী গণ্ড মধুর ভাবে নাড়িয়া কত বলিবে, "প্রাণেশ্বরি! প্রাণে আর ব্যথা দিও না!"—সে অমনি মুখ ফিরাইয়া শুইবে। স্বামী তাহার অধরে অধর মিশাইতে আসিবে—তৎক্ষণাৎ উপাধানে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিবে।

অভিমান নারীর একটী সুন্দর অলঙ্কার। প্রিয়তমা পত্নী স্বামীর নিকট অভিমান অভিনয় করিয়া তাঁহাদের চোখের জলে নাকের জলে ভাসাইতে থাকেন। সেই জন্যই অনেক পুরুষ মৃত্যুর পর নারী হইবার কামনা করেন।

মানুষ শুধু ভাবিয়াই যায়। কিন্তু একজন আছেন—কেহ বলেন, "তিনি নিরাকার।" কেহ বলেন, "তিনি আলোক।" কেহ বলেন,

"তিনি অনন্ত অসীম।" তিনিই মানুষের ভাবনাগুলি কখনও কখনও কার্য্যে সফল করান, আবার কখনও কখনও সে গুলিকে আকাশ-কুসুমে পরিণত করান।

১০

পুরী হইতে বাটী আসিবার যে দিনস্থির হইল, তাহার পূর্ব্বদিন যতীন্দ্রের একটু জ্বর হইল। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গগুলি বৃদ্ধি পাইল। উপসর্গগুলি যেন সুপ্ত ছিল, জ্বরের আহ্বান পাইবামাত্র তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়া নিজ কার্য্যে ব্রতী হইল।

রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাঘ মাসের শেষে রোগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। যতীন্দ্রের ভ্রাতা চন্দ্রনাথ বাবুকে সত্বর আসিবার জন্য 'তার' করিল।

চন্দ্রনাথ বাবু 'তার' পাইয়া উন্মত্তের মত অজ্ঞানাবস্থায় পুরী যাত্রা করিলেন। কন্যা চাঁমেলীকে সঙ্গে লইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে কখনও পুরী যান নাই। সুতরাং সঙ্গে স্ত্রীলোক লইতে সাহসী হইলেন না।

বাটীতে শ্যামাসুন্দরী মাঝে মাঝে নীরবে অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। তিনি আহার নিদ্রা ভুলিলেন—কেবল জামাতার কুচিন্তায় শরীরপাৎ করিতে লাগিলেন। চাঁমেলী আবার অশান্তির আঁধারে ডুবিল। বাটীর সকলের মনেই কেমন একটা অশান্তি। বাটীর জাঁকজমক নীরব হইল। কোলাহল থামিয়া গেল। সকলেই নীরবে বসিয়া বসিয়া উষ্ণশ্বাসে দিন কাটাইতে লাগিল। প্রকাণ্ড বাটীতে দিনে রাত্রে এইরূপ ভীষণ নীরবতা কেমনই একটা আশু অকল্যাণের বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল।

সেদিন দ্বিপ্রহরে শ্যামাসুন্দরী অন্দরমহলের বারান্দার উপর বসিয়া

দেওয়াল ঠেস্ দিয়া মুখে হাত দিয়া, অস্নাত অবস্থায় অনাহারে যতীন্দ্রের অসুস্থতার কথা ভাবিতেছিলেন। এমন সময়ে এক বৃদ্ধা তাহার একমাত্র অন্ধপুত্রের হাত ধরিয়া অন্দরের প্রাঙ্গণে আসিয়া "হরি বল মন; চারিটি ভিক্ষা পাই মা!" বলিয়া দাঁড়াইল।

কি করুণ দৃশ্য: বিধাতার রাজ্যে এমন দৃশ্যেরও অভাব হয় না! মায়ের অথর্ব্ব অবস্থায় কোথায় পুত্র তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইবে, তাহা না হইয়া মাতা তাহার লোলবক্ষ পলিত কেশ লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিতেছে—প্রৌঢ় পুত্রকে প্রতিপালন করিবার জন্য।

শ্যামাসুন্দরীকে ঐরূপ ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "মা! অমন ভাবে ব'সে আছ যে?"

শ্যামাসুন্দরী একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "অমনি।"

"না মা! তুমি যেন কি ভাব্ছ! কি ভাব্ছ মা? এ সংসারে কি ব'সে ব'সে ভাবলে চলে মা? এই দেখ ত আমার অবস্থা। শক্তি থাকা অবস্থায় আমি কোন দিন পথে বের হইনি! কিন্তু আজ আমার দেহে শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই, তবু আজ আমাকে আমার এই উপযুক্ত ছেলের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পথে বের হ'তে হ'য়েছে। এতদিন আমি ভিক্ষুক ছিলাম না। কিন্তু আজকাল আমি এই পুত্রের জন্য ভিক্ষুক সেজেছি। মানুষ কি পুত্র এই জন্যই চায় মা? যাক্, ভগবান যা অদৃষ্টে লিখেছেন, তাই হবে। সেজন্য মিছে ভেবে কি হবে? বাবা! একটা গান গাও ত। আমরা ব্রাহ্মণও নয়—বৈষ্ণবও নয় যে, ভিক্ষা আমাদেব উপজীবিকা হবে? বিনা পরিশ্রমে ভিক্ষা নেওয়াটা আমাদের সঙ্গত নয়! গাও ত বাবা!"

অন্ধপুত্র গাহিতে লাগিল—

ওমা! কেন ভাবিস্ মিছে ব'সে?
যার ভাব্না সেই ভাব্বে, তোর আমার ভাব্না কিসে?

যে জন্য এসেছিস্ ধরায়,
সে কার্য্য কর ত্বরায়.
কাজ ফুরালে চলে যাবি, থাক্‌বি না আর ব'সে।
ওমা তোর ভাব্‌না কিসে ?
যে ক'দিন রবি ভবে,
হেসে খেলে যা'না তবে,
মিছে ভেবে ভেবে হ'স্‌নে রে আর সারা।
ভাব্‌না করলে, চোখের জলে,
পথ ভুলে তুই হবি লক্ষ্যহারা॥
না ভেবে তুই বেড়াস হেসে,
নৈলে যে তুই যাবি ভেসে,
যার ভাবনা সেই ভাব্‌বে, তোর আবার ভাবনা কিসে ?

গান সমাপ্ত হইল। শেফালী একমনে গানটি শুনিতেছিল। চামেলী নিজ কক্ষের শয্যায় শুইয়া স্বামীর কথা ভাবিয়া যাইতেছিল—সঙ্গীতের দিকে তাহার আদৌ কাণ ছিল না।

শেফালী ভিক্ষুককে বিদায় করিয়া মাতাকে বলিল, "মা! এখন ওঠ। স্নান ক'রে দু'টি খেয়ে নাও। মিছে ব'সে ভাব্‌লে কি হবে ?"

শ্যামাসুন্দরী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিলেন। রুক্ষ মাথায় পুষ্করিণীতে স্নানে গেলেন। পুকুরে আসিয়া জলে না নামিয়া সিঁড়ির উপর বসিয়া মুখে হাত দিয়া আবার ভাবিতে বসিলেন।

মাতার স্নান করিয়া আসিতে বিলম্ব দেখিয়া শেফালী তাঁহার অন্বেষণে পুকুরে আসিল ; দেখিল, মাতা বসিয়া উদাস-দৃষ্টিতে কি যেন ভাবিতেছেন। তখন সে তাহার মাতার হাত ধরিয়া স্নান করাইয়া বাটীতে লইয়া গিয়া আহারে বসাইল। তিনি নামমাত্র আহার করিয়া উঠিয়া আবার তেম্‌নি ভাবে নীরবে বসিলেন। তিনি এমনি ভাবে দিবানিশ ভাবিতেন।

যতীন্দ্রের অকল্যাণ-চিন্তা ব্যতীত কল্যাণ-চিন্তা কোন সময়ের জন্যই তাঁহার মনে স্থান পাইত না। সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হইত যে, যতীন্দ্র বাঁচিবে না। তিনি ভগবানকে ডাকিয়া ব্যাকুলিত-প্রাণে কাতরকণ্ঠে কহিতেন, "ভগবান! জীবনের বিনিময়ে জীবন দিচ্ছি, নেও। আমার কন্যা চামেলীর জীবন গ্রহণ ক'রে, যতীনকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেও। একটী জীবনে যদি তোমার তৃপ্তি না হয়, তবে আমারও জীবন নেও। দু'টী জীবনের বিনিময়ে একটী জীবন ভিক্ষা দেও।"

ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা কি ভাবে গেল, কে জানে?

চামেলী নির্জ্জনে বসিয়া কত কাঁদিত—কত ভগবানকে ডাকিত। একদিন রাত্রে সে স্বপ্নে দেখিল—তাহার স্বামী বাঁচিবে না।—সে বিধবা হইবে। স্বপ্ন দেখিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও আর ঘুমাইতে পারিল না। রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সে জানিত,—শেষ-রাত্রির স্বপ্ন বড় নিষ্ফল হয় না। কিন্তু স্বপ্ন দেখিয়া যদি পুনরায় নিদ্রাভিভূত হওয়া যায়, তবে সে স্বপ্ন নিষ্ফল হয়।

সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও যখন সে ঘুমাইতে পারিল না, তখন সে কাঁদিতে লাগিল। ভগবানের নিকট অনেক মানত করিল। তাঁহার রুদ্ধ-করুণার দুয়ারে অনেক মাথা কুটিল।

ভগবানকে অনেক ডাকিল। আপন মনে অনেক কাঁদিয়া, বড় শ্রান্ত হইয়া, সে অবসন্ন হইয়া পড়িল। পরদিন অনেক বেলা হইল, তবু সে উঠিল না।

অনেক বেলা হইল, তবু চামেলী উঠিল না দেখিয়া, শেফালী তাহার কক্ষের দ্বারে আঘাত করিয়া বলিল, "চামি! উঠ্‌বিনে? বেলা যে অনেক হ'য়েছে।"

"হ্যাঁ, এই উঠ্‌ছি দিদি" বলিয়া চামেলী গাত্রোত্থান করিয়া, কক্ষের

রুদ্ধ-দ্বার উন্মুক্ত করিল। শেফালী তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি! তোর কি কোন অসুখ করেছে?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে উত্তর দিল, "কৈ, না?"

"কৈ না কি রকম? ঐ যে তোর মুখখানি ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছে, চোখ দুটীর নীচে কালি ঢেলে দিয়েছে।"

"ও কিছু না দিদি, একটু মাথা ধ'রেছিল। যন্ত্রণায় সারারাত্রি ঘুম হয়নি, তাই অমন দেখাচ্ছে।"

"তবে তুই শুয়ে থাক্ গিয়ে, আমি এখুনি ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠাই।"

"না, না দিদি, কোন দরকার নেই। এখন সেরে গিয়েছে।"

"মাথা যখন ধ'রেছিল তখন বলিস্ নি কেন? যাই আমি ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠাই।"

"না, না, দিদি—"

"না না কেন? তোর শরীর খুব দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে—ডাক্তার এসে একটু ওষুধ দিলেই, সব সেরে যাবে।" এই বলিয়া শেফালী চলিয়া যাইতেছিল। চামেলী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "না, না দিদি, আমার মাথা খাও, ডাক্তার ডেকো না। কা'ল হঠাৎ একটু মাথা ধ'রেছিল, এমন ত কোন দিন হয় নি, আর যদি কোন দিন এমন হয়, তবে ডাক্তার ডেকো।"

"নারে পাগ্‌লী, রোগের গোড়া থেকে চিকিৎসা করাই ভাল।"

"ডাক্তারে আমার বড় ভয় দিদি। সেদিন দেখ্‌লে ত দিদি, ও-পাড়ার মুখুয্যেদের দু' দু'টি সুস্থ ছেলে মেয়েকে ডাক্তার কেমন ক'রে মেরে ফেলে দিল! দু' দু'টি তাজা ডাগর ছেলে মেয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে ছট্‌ফট্ ক'রে দাপিয়ে দাপিয়ে ম'রে গেল। তাদের ত কোন অসুখই ছিল না, ছোট

ছোট ক্রমি মাঝে মাঝে মলদ্বারে এসে সুর্‌সুর্ কর্‌ত। ডাক্তার না ডেকে একটু আনারসের পাতার রস ক'রে খাইয়ে দিলেই হ'ত।"

"হ্যাঁ, তা' হ'ত, তবে ওটা যেন হ'ল ওষুধের গোলমালে। ডাক্তারের ত কোন দোষ নয়। একটা ওষুধ দিতে অন্য একটা ওষুধ ভুল ক'রে কম্পাউণ্ডার দিয়ে দিল। আর নিয়তির বাধ্য জগৎশুদ্ধ।"

"তবে আর ওষুধের প্রয়োজন কি? নিয়তিই যদি মান, তবে অদৃষ্টে যা' আছে,—তা' হবেই।"

"হ্যাঁ, তা' বটে, তবে মন বোঝে না।"

"মন যদি না বোঝে, তবে টোট্‌কা মোট্‌কা যা' হয় একটু কর্‌লেই হয়,—সামান্য অসুখে ডাক্তারের প্রয়োজন কি দিদি?"

"বেশ, তবে যাই, ও-ঘরের ঠাকু'মা'র কাছে তোর মাথা ধরার কথা বলি গিয়ে; তিনি যে ওষুধ কর্‌তে বলেন,—তাই কর্‌ব।" এই বলিয়া শেফালী চলিয়া গেল। চামেলী পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিল।

শুইয়া পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল,—"সত্যই যদি স্বপ্ন সত্য হয়, তবে—তবে আর ওষুধের প্রয়োজন কি? দিন দিন দুর্ব্বল হ'তে হ'তে, একদিন একেবারে দুর্ব্বল হ'য়ে অবশ অসাড় নিশ্চল হ'য়ে যাই।"

ফাল্গুনের প্রারম্ভ। শীতের প্রকোপ একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। মলয় বাতাস পৃথিবীকে সুগন্ধ দিয়া আনন্দের উৎস ছুটাইয়া দিতেছে। কুহু কুহু স্বরে কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া শান্তির প্রস্রবণ বহাইতেছে। প্রস্ফুটিত নানাজাতীয় পুষ্পের মধু আহরণ করিয়া ভ্রমর গুন্ গুন্ করিয়া পরম-কারুণিক পরমেশ্বরের গুণ-গান করিতেছে। চন্দ্রের সুষমা ভগবানের চরণে আছাড়ি-বিছাড়ি খাইয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। বসন্ত-হিল্লোল-পরশে বৃক্ষরাজি ষোড়শী যুবতীর মত সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে। চারিদিকে হাসি—চারিদিকে আনন্দ।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের হাসি দেখিয়া মনে শান্তি এবং আনন্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পারিবারিক অশান্তি মনের মধ্যে জাগ্রত থাকিলে, প্রকৃতির বিরাট সৌন্দর্য্যের হাসি দেখিয়াও মনে একবিন্দু শান্তি, এক কণা আনন্দ পাওয়া যায় না; পাওয়া যায় কেবল হাহাকার,—দারুণ হাহাকার—বুকফাটা হাহাকার।

এমনি বসন্ত সমাগমে সুগন্ধ-পরিপূর্ণা, শীতল মলয়-প্রবাহিতা কত হাস্যোজ্জ্বলা রজনীতে, যতীন্দ্রনাথ এবং চামেলী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উৎফুল্ল-হৃদয়ে পুলকিত-মনে পরস্পর পরস্পরকে দৃঢ় প্রেমালিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া অধরে অধর স্পর্শ করিয়া প্রাণ খুলিয়া কত কথা কহিয়াছে—কত হাসি হাসিয়াছে! আর আজ?

চামেলী স্বামীর উপর অভিমান করিয়াছিল। ভবিষ্যৎ মিলন-রাত্রে কেমন করিয়া অভিমান অভিনয় করিতে হইবে, তাহা সে একদিন ভাবিয়াছিল, কিন্তু আজ? আজ সে কি ভাবিতেছে?—কেন সে অভিমান করিয়াছিল? কেন সে স্বামীর পত্রের উত্তর দেয় নাই?—আজ তাহার হৃদয় তাহারই কৃত গুরুতর অপরাধের জন্য দুর্দ্দমনীয় আন্‌চান্ ভাব অসহ্য, বড় অসহ্য দাহর সৃষ্টি করিয়াছে! আজ তাহার বড় ইচ্ছা হইল—স্বামীর নিকট পত্র দিতে। কিন্তু কাহাকে সে পত্র দিবে? কে তাহার পত্র পড়িবে? স্বামী? সে যে মরণোন্মুখ! তাহার ত' বাঁচিবার আশা নাই! সে যে স্বপ্ন দেখিয়াছে—স্বামী বাঁচিবে না! তাহার প্রাণের মাঝে অহোরাত্র কে যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে—'তোর স্বামী বাঁচিবে না—মরিবে—নিশ্চয় মরিবে—তোরই অবহেলার জন্য—তোরই ত্রুটির জন্য!' তাহার বড় ইচ্ছা হইল, নতজানু হইয়া অনুনয় বিনয় সহকারে স্বামীর কাছে বলিতে—স্বামিন্! আমার অপরাধ নিও না! আমি অতি অজ্ঞ—অতি নির্ব্বোধ, তাই তোমার উপর অভিমান ক'রেছিলাম! আর তোমার

উপর অভিমান কর্‌ব না,—জীবনে কোন দিন কোন লহমার জন্যও না! এস, এস স্বামিন্! তুমি আর মৃত্যু বরণ কোরো না। তুমি যে আমায় ভালবাস—বড় ভালবাস! তবে কেন আমার উপর রাগ কর্‌বে? আমি যে তোমার করুণার ভিখারিণী! জন্মজন্মান্তরের করুণার ভিখারিণী! আমায় দয়া কর—আমার কাতর করুণ প্রার্থনা একবার কাণ দিয়ে শোন! আমি যে তোমা বই কিছু জানি না! তোমাকে আরাধ্য দেবতা ক'রে আমি যে তোমাকে আমার হৃদয়ের নিভৃতদেশে বসিয়েছি! আমার জীবন-তরির কর্ণধার ক'রেছি! তোমার ইচ্ছা মত এ তরি যথা-ইচ্ছা নিয়ে যাও; যে দিকে ইচ্ছা বেয়ে নিয়ে যাও—নরকে হয়, তা'ও যেতে প্রস্তুত আছি! তুমি যে স্থানে থাক্‌বে, সেই স্থানই যে আমার স্বর্গ—সেই স্থানেই আমার আনন্দ—সেই স্থানেই আমার সুখ, শান্তি, তৃপ্তি! আমি অতি হীনা, অতি দীনা, অতি দরিদ্রা, অতি কাঙ্গালিনী! আমাকে তুমি আরও হীন, আরও দীন, আরও দরিদ্র, আরও কাঙ্গাল ক'রে দিও না! তা' হ'লে যে আমি বড় ব্যথা পাব! সে ব্যথা ত আমি সইতে পার্‌ব না! আমি যে অবলা—দুর্ব্বলা নারী! তুমি আমায় পরিত্যাগ কোরো না! তুমি যদি পরিত্যাগ কর, তবে আমি আত্মঘাতিনী হব! তোমার দু'খানি চরণ ধরি—তুমি আমাকে পায়ে ঠেল না! তোমাকে যে আমি কত ভালবাসি, কত আদর করি, কত সোহাগ করি! চেয়ে দেখ, তোমার জন্য কত বিনিদ্র রজনীতে নয়ন-জলের প্রকাণ্ড নদী বহাইয়ে দিয়েছি! তার প্রতিদানে কি তুমি আমার একটী, মাত্র একটী প্রার্থনা রাখ্‌বে না! তার বিনিময়ে তোমার করুণার দুয়ারে আমার একমাত্র প্রার্থনা—তোমার চরণতলে আমার একমাত্র ভিক্ষা,—তুমি আমায় ছেড়ে যেয়ো না! প্রভো! স্বামিন্! প্রাণেশ্বর! হৃদয়-দেবতা! তুমি বিনা আমি কার? লতিকা যেমন বিটপীকে জড়িয়ে ধ'রে মস্তক উন্নত ক'রে ওঠে, আমিও তোমায় তেম্নি ক'রে জড়িয়ে ধ'রে উঠেছি! এখন

যদি তুমি শুকিয়ে যাও, তবে আমাকে তোমার উদার বক্ষের উপর চেপে ধ'রে শুকিয়ে যেয়ো! এই প্রলোভনপূর্ণ ঘৃণিত পৃথিবীর মাঝে, নিষ্ঠুর, পাষাণ, হৃদয়হীন হ'য়ে আমায় পরিত্যাগ ক'রে যেয়ো না নাথ!

১১

যতীন্দ্রনাথের ব্যাধির জ্বালা কোন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কোন দিন হ্রাস হইতে লাগিল। রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। তাহার শয্যার পার্শ্বে দিবারাত্র লোক থাকিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তাহার মাতা আহার নিদ্রা ভুলিয়া তাহার শিয়রে বসিয়া অন্যের অজ্ঞাতসারে অশ্রুজল ফেলিতে লাগিলেন, দেবতার নিকট অনেক মানত্ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রনাথবাবু প্রাণপণ-শক্তিতে জামাতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

যতীন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে তাহার শ্বশুরকে বলিত, "মা একা মেয়েলোক, পেরে উঠেন না, আর কাউকে আন্‌লে মায়ের পরিশ্রমের লাঘব হ'ত।" চন্দ্রনাথ বাবু জামাতার এ কথায় স্পষ্টই বুঝিতেন যে, তাঁহার কন্যাকে এসময় এখানে আনা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু কন্যাকে আনিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না; কারণ, বাটীতে এমন কেহ নাই যে, বয়স্থা কন্যা চামেলীকে পুরীধামে আনিয়া দেয়। জামাতাকে এইরূপ অবস্থায় ফেলিয়া তাঁহার নিজের যাওয়াও অসঙ্গত। সুতরাং চামেলীকে আনা হইল না।

শুক্রবার রাত্রে যতীন্দ্রনাথের অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইল। ডাক্তার আসিল। ডাক্তার সারারাত্রি জাগিয়া রোগীর নিকট বসিয়া রহিল; তাঁহার সঙ্গে সকলেই বিনিদ্র-নয়নে রোগীর শুশ্রূষা করিল। সকলেই ভগবানকে ডাকিল—আকুলকণ্ঠে ব্যাকুলিত-হৃদয়ে ডাকিল।

প্রভাত হইল। ডাক্তার ম্লানমুখে চলিয়া গেল। রোগী নিস্তেজ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। সকলে ভাবিল—যতীন্দ্র অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। প্রায় দুই ঘণ্টা নিদ্রা যাইবার পর যতীন্দ্রনাথ নয়ন মেলিল। পার্শ্বে তাহার মাতা বসিয়া ছিলেন। সে মাতাকে দেখিয়া একবার মাত্র "মা" বলিয়া ডাকিল। তাহার পর আর কোন কথা না কহিয়া আবার চক্ষু নিমীলিত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে আবার নয়ন মেলিল। চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া কাহাকে যেন খুঁজিল।

চন্দ্রনাথ বাবু তখন ডাক্তারের নিকট ঔষধ আনিতে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। যতীন্দ্রনাথ তাহাকে দেখিয়া কহিল,—"চামেলী ?" চন্দ্রনাথ বাবু কোন উত্তর না দিয়া, হৃদয়ে গাঢ় বেদনা অনুভব করিয়া গন্তব্য-স্থানে চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু ডাক্তারের নিকট যাইবার পরই, যতীন্দ্র সর্ব্বগাত্রে কেমনই একটা অসহ্য দাহ অনুভব করিয়া ছটফট্ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তাহার বৃদ্ধা মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও-রকম কর্‌ছিস্ কেন বাবা ?"

যতীন্দ্র সে-কথার কোন উত্তর দিল না। তাহার মাতা ব্যজনদ্বারা তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। সে ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল। আর ছটফট্ করিল না। মাতা ভাবিলেন—পুত্র ঘুমাইয়াছে।

যতীন্দ্রের ভ্রাতা বাজার হইতে যতীন্দ্রের পথ্যের জন্য বেদানা আঙ্গুর প্রভৃতি কিনিয়া আনিয়া মাতাকে বলিল, "মা! দাদাকে শীঘ্র পথ্য দাও।" মাতা কহিলেন, "যতু ঘুমুচ্ছে এখন; ঘুম থেকে উঠ্‌লেই পথ্য দেব; কাঁচা ঘুমে জাগালে অসুখ বাড়বে।" মাতা বুঝিলেন না—এ বড় চমৎকার ঘুম! এই দুঃখকষ্ট-পরিপূর্ণ সংসারে এমন ঘুম ঘুমাইতে পারিলেই অনন্ত শান্তি! এ ঘুম যে ঘুমায়, সে আর জাগে না। জীবনে এ ঘুম একবার মাত্রই ঘুমাইতে হয়। এ ঘুম সংসারের সকল জ্বালা ভুলাইয়া দেয়!

এ ঘুম মিথ্যা মায়াপাশের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেয়! এ ঘুম আত্মীয়স্বজনদের চীৎকার করাইয়া কাঁদাইয়া দেয়! এ ঘুম ছিন্ন বস্ত্রসম বাহিরের দেহ রাখিয়া সূক্ষ্ম-দেহে অনন্ত শান্তি, অনন্ত সুখ পাইবার জন্য সেই দেশে চলিয়া যায়, যে দেশ সতত আনন্দের—সতত সুখের! সে দেশের নদী স্বচ্ছ সুমিষ্ট বারিরাশি লইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিয়া গাহিয়া প্রাণ মুগ্ধ করাইয়া দিয়া চলিয়া যায়! সে দেশের কুসুম সুগন্ধ বিস্তার করিয়া সতত প্রাণ উৎফুল্ল রাখে! সে দেশে চির-বসন্ত বিরাজিত! সে দেশে দুঃখ নাই—কষ্ট নাই—শোক নাই—তাপ নাই—আছে শুধু অনন্ত শান্তি—অফুরন্ত সুখ—অপর্য্যাপ্ত আনন্দ—অসীম উল্লাস! সে দেশে বিরহ নাই—আছে শুধু অবিচ্ছিন্ন মিলন! এমন সুন্দর দেশ কাহার না ঈপ্সিত, কাহার না বাঞ্ছিত!

চন্দ্রনাথ বাবু ঔষধ হাতে করিয়া যতীন্দ্রের কক্ষে আসিয়া যতীন্দ্রের দিকে চাহিয়াই কাঁপিয়া উঠিলেন। দেখিলেন—যতীন্দ্রনাথ নীরব—নিথর—নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ! দেহ নিষ্প্রাণ—অসাড়—কঠিন—শীতল! মুখ মলিন, চক্ষু অর্দ্ধোন্মুক্ত, তারকা স্থির! তাঁহার প্রাণ সশব্দে স্পন্দিত হইতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল—পৃথিবী-ফাটা চীৎকার করিয়া অশ্রুর স্রোতে নদী বহাইয়া কাঁদিতে! কিন্তু পারিলেন না। শত চেষ্টা করিয়াও একবিন্দু অশ্রু চ'খে আনিতে পারিলেন না। চীৎকার করিবার শক্তি হৃদয়ের মধ্যে খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁহার মাথা বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল, যেন পৃথিবী তাঁহার চতুঃপার্শ্বে দ্রুত ঘুরিতেছে! নাতি উচ্চৈঃস্বরে "বাবা" বলিয়া হতছিন্ন মূলক্রমের মত তিনি সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন! যতীন্দ্রের মাতা বৈবাহিককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বেয়াই! প'ড়ে গেলে নাকি?"

চন্দ্রনাথ বাবু সে কথার কোন উত্তর দিলেন না! ক্ষণপরে যতীন্দ্রের

মাতা বলিলেন, "যতীন অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে—এখন ডেকে জাগিয়ে ওষুধ খাওয়ান যাক্ ; ওষুধ আগে খেয়ে শেষে পথ্য কর্‌বে।"

চন্দ্রনাথ বাবু কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন—"আর কিছু দিতে হবে না, রোগ সেরে গিয়েছে, ৺জগন্নাথের কৃপায় আর ও-শরীরে কোন ব্যাধি হবে না। বাবা জগন্নাথের অসীম করুণায় যতীন পরমশান্তি পেয়েছে।"

এই কথা শুনিয়া যতীনের মাতা বিকৃত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এ্যাঁ! কি ব'ল্‌ছ বেয়াই!"

চন্দ্রনাথ বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ব'ল্‌ব কি বেয়ান্! যতীন আর নেই ; বাবা আমাদের মায়া ছেড়ে চ'লে গিয়েছে। ও হো—হো—"

যতীন্দ্রের মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মেঝের উপর মাথা খুটিয়া বলিলেন, "এ্যাঁ! যতু নেই? বাবা আমার নেই?" এই বলিয়া পুত্রের বক্ষ সজোরে জড়াইয়া ধরিয়া কাতর-চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা! কথা কও! এই যে একটু আগে কথা ক'য়েছিলি—এই যে একটু আগে মা ব'লে ডেকেছিলি! বাবা আমার! মা' ব'লে ডাক্! তোর ঐ সুধামাখা-কণ্ঠে এই "মা" নাম শুন্‌বার জন্যই যে তোকে আমি দশমাস দশ দিন গর্ভে ধ'রে কত যন্ত্রণা সহ্য ক'রে, তোকে আজ এত বড় ক'রে তুলেছি! আমি যে তপ্ত বক্ষ রক্ত দিয়ে তোকে মানুষ করেছি! নিজেকে বঞ্চনা করে তোকে কত খাইয়েছি! এই বুকের মাঝে জড়িয়ে ধ'রে হৃদয়ের অদৃশ্য অতল অপার স্নেহ দিয়ে তোকে ঘিরে রেখেছি! অসীম অনন্ত ভালবাসা দিয়ে তোকে ঢেকে রেখেছি! প্রতিদানে শুধু চেয়েছি, "মা" ব'লে ডাকা! বাবারে আমার! ডাক্, একবার ডাক্. "মা" ব'লে ডাক্! সন্তানের কণ্ঠে মাতৃসম্বোধনে শোকসন্তপ্ত অশান্তিপূর্ণ-হৃদয়ে শান্তির আলোক উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে—দুঃখ-কষ্ট-ক্লিষ্ট অসুখী অন্তঃকরণে সুখের উৎস ফুটে ওঠে—জরাজীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত নিরানন্দ

প্রাণে আনন্দের প্রস্রবণ ব'হে যায়—দুর্ব্বল মরণোন্মুখ জীবন আবার সবল সুস্থ জীবন্ত হ'য়ে দাঁড়ায়—নিস্পন্দ দেহ স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে—অসাড় সাড়া দেয়! বাবা আমার! ওঠ্—কথা ক'—তেম্‌নি ভাবে "মা" ব'লে ডাক্! "মা" ব'লে ডেকে এই বৃদ্ধার জীর্ণশীর্ণ দেহ সবল সুস্থ ক'রে দে! এই শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে শান্তি দে! বাবা আমার! তুই ত কোন দিন আমার কথার অবাধ্য হ'স্ নি! ভাল মন্দ মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা না ক'রে দৈববাণীর মত আমার আদেশ অবনত-মস্তকে অনতিবিলম্বে দ্বিধা না ক'রে প্রতিপালন করেছিস্! আজ কেন আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর্‌তে এত বিলম্ব কর্‌ছিস্!—এত দ্বিধা কর্‌ছিস্! আমার আদেশ, মায়ের আদেশ প্রতিপালন কর্‌তে যদি তুই তোকে অসম্মানিত মনে করিস্—অপমানিত মনে করিস, তবে আমি আর তোকে আদেশ কর্‌তে চাইনা; মা' আমি, সন্তানের কাছে কাকুতি মিনতি ক'রে, বড় দরিদ্র—বড় কাঙ্গালের মত তোর দয়া ভিক্ষা কর্‌ছি,—একবার মা' ব'লে ডাক্! একবার—একবার—মাত্র একবার! এই লোল-চর্ম্ম, পলিত-কেশ দেখেও কি তোর দয়া হ'চ্ছে না? বাবা! তুই ত বড় দয়ালু ছিলি—নিষ্ঠুরতা তোকে কে শিখাল? আমার এক আহ্বানে, তুই যেখানে থাক্‌তিস, সেখান থেকে দৌড়ে এসে আমার চরণ-ধূলি মাথায় নিয়ে, শিশুটির মত আমার ক্রোড়ে বসে বক্ষ জড়িয়ে ধরে স্কন্ধে মাথা রেখে, 'মা—মা'—বলে ডাক্‌তিস্! সে ডাক শুনে যে আমি আত্মহারা হ'য়ে যেতাম! সে ডাক যে আমার ইহকাল ভুলিয়ে দিত! বাছা আমার! তেম্‌নি ক'রে একবার ডাক্! বাবা আমার! তুই যে বলেছিলি—তোর অসুখ সেরে গেলে আমাকে তুই ৺বৈদ্যনাথ নিয়ে যাবি, ৺কাশীধামে নিয়ে যাবি; ৺কালীঘাট নিয়ে যাবি—এখন ত' তোর অসুখ সেরে গিয়েছে, এখন আমায় সেই সকল স্থানে নিয়ে চল্! কৈ, কথা কচ্ছিস না যে! আমায় সে সকল স্থানে নিয়ে

যাবি না? মা' বলে' ডেকে বৃদ্ধামাতার কম্পিত হাত দু'খানি ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবি না? ওঠ্ বাবা আমার! চোখ মেলে চা' কথা ক'—কি নীরব! নিথর! তবে কি সত্যই তুই আর নেই! এতদিন যাকে মা' বলে ডেকে দেবতার অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করেছিস, আজ চিরদিনের জন্য তার মায়া কাটিয়ে, তার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করে, কোথায় চলে যাস্?—না, না—চলে ত যাস্‌নি! এই যে আছিস্—এই যে আছিস্—এই যে আমার বুকে বুক লাগিয়ে আছিস্—এখন তোর শরীরে উত্তাপ নেই—বেশ শীতল! জ্বর ছেড়ে গিয়েছে! এখন তোর রোগের সমস্ত উপসর্গগুলি লুপ্ত হ'য়েছে—তাই তুই সুস্থ হ'য়ে বেশ ঘুমুচ্ছিস্—একটু বাদে আবার জাগ্‌বি—আবার উঠ্‌বি—আবার 'মা, মা,' বলে' ডেকে ডেকে আমাকে মাতোয়ারা ক'রে তুল্‌বি!—"

হায়রে সন্তান-জননী! সন্তান তোমাদের কি? সন্তান, যাহার একবিন্দু তৃপ্তির জন্য, জননী তাহার সমস্ত সুখশান্তি দ্বিধা না করিয়া মূহূর্ত্তে বিসর্জ্জন দিতে পারে--প্রয়োজন হইলে মরণের নিষ্ঠুর বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে! সন্তান, সে সুন্দরই হউক অথবা কুৎসিতই হউক, সে শিক্ষিতই হউক অথবা মূর্খ ই হউক, সে সচ্চরিত্রই হউক অথবা লম্পটই হউক, সে জননীর নিকট নির্মেঘ শরতাকাশের পূর্ণ শশধরের মত সতত সুন্দর—সদা মনোহর!

যতীন্দ্রের ভ্রাতা অন্য কক্ষে ছিল। মাতার চীৎকারে মৃত্যু-ক্রন্দন শুনিয়া সমস্ত বুঝিয়া স্পন্দিতবক্ষে, কম্পিত-পদে, সে দৌড়াইয়া আসিয়া যতীন্দ্রের চরণ-যুগল বক্ষে ধরিয়া "দাদা গো! আমায় ফেলে কোথায় গেলে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

এযে ভাই! ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালবাসা,—সে যে উন্মুক্ত নভঃমণ্ডলের চেয়েও বিরাট! ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের স্নেহ, সে যে

শুভ্র জ্যোৎস্নার চেয়েও পবিত্র! ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের আন্তরিকতা—সে যে নির্ম্মলাকাশের প্রাতঃসূর্য্যের চেয়েও মহান্!

একই মায়ের গর্ভে জন্ম লইয়া, একই মায়ের বক্ষ রক্তপান করিয়া, একই মায়ের স্নেহ-ছায়ায় পালিত হইয়া, একই মা'কে ভক্তিপূর্ণ কোমল-কণ্ঠে মা' বলিয়া ডাকিয়া, পাষাণকে দ্রব করিয়া, যাহারা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহারা কি পরস্পরের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে?

চন্দ্রনাথ বাবু জামাতার জন্য বেশী অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন না। যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য ক্রন্দন কেন? কাঁদিলে সে'ত আর ফিরিয়া আসিবে না। তৈলশূন্য নির্ব্বাপিত প্রদীপ, কাঁদিলে যদি আলেয়ার মত জ্বলিয়া উঠিত, তবে তিনি কাঁদিতেন—এমন কাঁদিতেন যে, তাঁহার ক্রন্দনের অশ্রুজলে একটা বিরাট প্রকাণ্ড পারাবার সৃষ্ট হইয়া, এই পৃথিবীকে তাহার অতল জলধিতলে ডুবাইয়া ফেলিত!

সে চলিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য বৃথা ক্রন্দন কেন? সে যে জরাজীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত জীবনের অবসান করিয়া, অনন্ত শান্তি-ধামে আশ্রয় লইয়াছে! প্রকৃত কেহ যদি কাহাকেও ভালবাসে, তবে কি তাহার, তাহার জন্য ক্রন্দন করা উচিত? কাঁদিয়া কেন তাহার সদ্য শান্তিপ্রাপ্ত আত্মাকে অশান্তি দিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলা? যে চলিয়া গিয়াছে—সে যে সংসারের দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়াই, সুখান্বেষণে অনন্ত শান্তিধামে চলিয়া গিয়াছে! সেখানে যে যায়—সেই শান্তি পায়—সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ভোলে!

চন্দ্রনাথ বাবুর নয়নদ্বয় হইতে জলপ্রপাতের মত অবিশ্রান্ত ভাবে জল পড়িতে লাগিল—কেবল তাহার কন্যা—প্রাণাধিকা কন্যার জন্য। কিশোরী কন্যার বৈধব্যের জন্য তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে একটা বেদনা সতত তাঁহার বক্ষকে শতধা বিদীর্ণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল, কিন্তু পারিল না,

বোধ হয় তাঁহার বক্ষের অস্থি সংসারের নিষ্ঠুরতায় পাকিয়া গিয়া লৌহ অপেক্ষা কঠিন হইয়া গিয়াছিল।

১২

চন্দ্রনাথ বাবু পুরী হইতে কলিকাতায় আসিতে, এই সুদীর্ঘ সময়টুকু অতিবাহিত করিলেন—স্নেহময়ী কন্যা চামেলীর চিন্তায়! কেমন করিয়া তিনি কন্যার বৈধব্য বেশ দেখিবেন—সিন্দুরহীন শুভ্র সিঁথি—পরিধানে সাদা থানফাড়া ধুতি—নিরালঙ্কারা দেহ!' কোন্ প্রাণে তিনি কন্যার আহারে সংযম সহ্য করিবেন—দিনরাত্রের মধ্যে মাত্র একবার আতপ-তণ্ডুলের অন্ন—মৎস্য মাংস বিবর্জ্জিত খাদ্য—একাদশীতে নিরম্বু উপবাস, না—না—এযে অসহ্য! যাকে সতত হাস্যময়ী, সঙ্গীতমুখরা, সালঙ্কারা দেখিয়াছেন,—তাহাকে আজ হইতে কি করিয়া হাস্যবিবর্জ্জিতা, বিষণ্ণ-বদনা, নিরালঙ্কারা দেখিবেন! একদিন যে মুখ, সদা হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিত, আজ হইতে সে মুখ ত তেমনি ভাবে আর কথা কহিবে না! তাহার প্রতি-কথায় যে কেমনই একটা বেদনামাখা ভাব পরিস্ফুট হইবে! একদিন যে মুখ হইতে সতত সুন্দর লাবণ্য বাহির হইত, আজ হইতে সে মুখে ত আর তেমন লাবণ্য থাকিবে না! সে আননের লাবণ্য অন্তর্হিত হইয়া আঁধারাবৃত হইবে! সে মুখ যে মৃত্যুর মত মলিন হইয়া যাইবে! বড় দুঃখে, বড় জ্বালায়, সে মুখখানি নিষ্প্রভ হইবে! কেমন করিয়া সে মুখ পিতা হইয়া তিনি দেখিবেন! যে মুখখানি হইতে ভক্তিপূর্ণ-কণ্ঠে গদ্গদ্ভাবে "বাবা! বাবা!" আহ্বান ধ্বনিত হইত, আর ত সে মুখখানি হইতে তেমনি ভাবে "বাবা! বাবা!" ধ্বনি আগ্রহে ধ্বনিত হইয়া তাঁহার হৃদয়তারে ঝঙ্কৃত হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুলিত করিবে না! একদিন যে কণ্ঠ হইতে সর্ব্বদা কোকিলের মত সুমিষ্ট সুললিত স্বরে গান

বাহির হইত, আজ হইতে সে কণ্ঠে তেমনি ভাবে আর ত সে সুর ধ্বনিত হইয়া প্রাণটিকে মুগ্ধ করিবে না! বিধাতঃ! তোমার সৃজিত এই সুন্দর মনোহর রাজ্যে পিতাকে সৃজন করিয়াছিলে কেন প্রভু? করিয়াছিলে যদি, তবে পিতার হৃদয়ে অসীম স্নেহরাশি, অনন্ত ভালবাসা, অপার কোমলতা, অপরিহার্য্য চিরস্মরণীয় মায়া মমতা দিয়াছিলে কেন নাথ! যদি দিয়াছ প্রভু! তবে কেন নাথ তাহার কোমল হৃদয়ে এ হেন ভীষণ বাজ হান! এই কি তোমার, তোমারই সন্তানের উপর অসীম করুণা—অনন্ত প্রেম—অশেষ ভালবাসা! এই কি তোমার স্নেহ, মমতা! এই কি তোমার কোমলতা সহৃদয়তা! ভগবন! তোমার এমন করুণা, এমন প্রেম, এমন ভালবাসা, এমন স্নেহ, এমন মমতা, এমন কোমলতা, এমন সহৃদয়তা, তোমারি গড়া, তোমারি সৃষ্ট পিতার হৃদয় যে সহ্য করিতে পারে না দেব! বক্ষটা যে চৌচির হইয়া বিদীর্ণ হইয়া যাইয়া তাহার মধ্য হইতে কেমন একটা ভীষণ নীরব হাহাকার ধূপের মত ঊর্দ্ধে উঠিয়া গগন ভেদ করে! হৃদয়মাঝে একটা সুপ্ত আর্ত্তনাদ চমকিয়া উঠিয়া জাগিয়া হৃতশাবা ব্যাঘ্রীর মত উন্মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়! এই কি তোমার সুশাসন?—এই কি তোমার সুবিচার?—এই কি তোমার ভালবাসা?—না,—এ তোমার অত্যাচার—এ তোমার অবিচার—এ তোমার নিষ্ঠুরতা! নিষ্ঠুর, অত্যাচারী রাজরাজেশ্বর! কোন্ সাহসে তুমি এত অত্যাচারী হইয়াছ? যদি তোমার এই অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হইয়া এই প্রপীড়িত পিতার দল, উদ্দীপ্ত হইয়া, প্রমত্ত বিক্রমে গর্জ্জিয়া উঠিয়া, দলিত ভুজঙ্গের মত, শত সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া, তোমাকে আক্রমণ করিতে রণোল্লাসে ধাইয়া আসে, তবে তুমি কি করিতে পার?—কোন্ মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদের বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করিতে পার? কি মহাশক্তি আছে তোমার? নির্ম্মমতা—নিষ্ঠুরতা?

তাহারা ত তোমার নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার কুটিল ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না! তুমি যে তাহাদের মিলিত উষ্ণ নিঃশ্বাসে হাউয়ের মত দ্রুত তীব্র জ্বালায় দূরে,—বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইবে! সাধ্য কি তোমার—বার্দ্ধক্যপ্রপীড়িত সঙ্কুচিত চর্ম্মের ঐ স্থাবর দেহ নিয়ে, তোমারই বিদ্রোহী সন্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে! কিন্তু তোমার সন্তানদের শক্তি নাই—কোন শক্তি নাই! শক্তি যে তুমি তাহাদের এখনও দেও নাই, পাছে তোমার এই উদ্ধত অনভিজ্ঞ পুত্রেরা তোমারি সুশাসনের ব্যাঘাত ঘটায়! প্রভু! জানি তুমি দয়াময়! জানি তোমার আশীর্ব্বাদ নিয়ত অকাতরে তোমার এই মূর্খ সন্তানদের উপর নির্ম্মেঘাকাশের প্রভাত সূর্য্যের সুন্দর রশ্মির মত বর্ষিত হইতেছে। জানি—তুমি যাহা কর, সমস্তই তোমার সন্তানদের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু প্রভু! তোমার অজ্ঞ সন্তানেরা যে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না! জানি, তুমি সঙ্গীতের পর নীরবতা দেও—সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিকে চিনাইবার জন্য। জানি, তুমি আলোকের পর আঁধার দেও—আলোকের মাধুর্য্য দেখাইবার জন্য। জানি, তুমি সুখের পর দুঃখ দেও—সুখের আস্বাদ বুঝাইবার জন্য। জানি, তুমি মিলনের পর বিরহ দেও—মিলনের মিষ্টত্ব অনুধাবনের জন্য। কিন্তু দেব! তোমার সন্তানেরা যে তোমার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না! তাহারা যে সঙ্গীতের কোলে নীরবতা, আলোকের পর আঁধার, সুখের পর দুঃখ, মিলনের পর বিরহ সহ্য করিতে পারে না! তাহারা কেবল চাহে—সঙ্গীতের দ্বারা মোহিত হইতে, আলোকের মাঝে ভাসিয়া বেড়াইতে, সুখের মধ্যে নৃত্য করিতে, মিলনের ভিতরে গান গাহিতে! তাহারা জানে না—সঙ্গীতের কোলে নীরবতা না থাকিলে, সঙ্গীতের মোহিনীশক্তি থাকিত না। তাহারা জানে না—আলোকের পর আঁধার না থাকিলে,

আলোকে সতত ভাসিয়া বেড়াইতে সাধ হইত না। তাহারা জানে না—সুখের পর দুঃখ না থাকিলে, সুখে সর্ব্বদা নৃত্য করিতে বাসনা জাগিত না। তাহারা জানে না—মিলনের ভিতরে বিরহ না থাকিলে, মিলনে সদা গান গাহিবার প্রবৃত্তি হইত না। না,—না, তাহারা জানে প্রভো! তোমার প্রত্যেক সন্তানই তোমার এই মহিমা জানে, কিন্তু জানে না—বোঝে কিন্তু বোঝে না। তাহারা বড় কোমল—বড় অজ্ঞ। তাই, অত্যাধিক কষ্ট পাইলেই তাহাদের বুকের কোন্ এক নিভৃত দেশ হইতে কেমনই একটা বুকফাটা বেদনা বাহির হইতে থাকে! আঁখিযুগল শাসন মানিতে চাহে না—আপন মনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া প্রাণের ব্যথার কিঞ্চিৎ লাঘব করে!

১৩

চন্দ্রনাথ বাবু কলিকাতায় পঁহুছিয়া জ্যেষ্ঠ জামাতা সতীন্দ্রনাথের মেসে উঠিয়া সতীন্দ্রনাথকে দেখিয়া "যতীন আর নেই" বলিয়া শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিলেন। সে ক্রন্দন দেখিয়া সতীন্দ্রনাথের চক্ষেও জল আসিল—বাক্‌রুদ্ধ হইল। সে আর কোন কথা কহিতে পারিল না। চন্দ্রনাথ বাবু দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। সতীন্দ্রের শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন।

সতীন্দ্রনাথ জানিত, তাহার কনিষ্ঠ ভায়রার পিতা তাহার মেসের অনতিদূরে বাসা করিয়া আছেন। তাঁহাকে সংবাদ দিয়া আনিলে, তিনি শ্বশুরমহাশয়কে সান্ত্বনাবাক্যের দ্বারা শান্ত করিতে পারিলেও পারিতে পারেন—এইরূপ স্থির করিয়া সে কনিষ্ঠ ভায়রা নন্দকুমারের পিতার বাসায় উপস্থিত হইল।

নন্দকুমার তখন তাহার পাঠাগারে পরীক্ষার অধ্যয়নে রত ছিল।

সম্মুখে রাক্ষসী পরীক্ষা বিরাট বদন ব্যাদন করিয়া পরীক্ষার্থীদের গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিতেছিল। তাহার বিষাক্ত উষ্ণ নিঃশ্বাসে শক্তিশালী যুবকেরা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া অকাল বার্দ্ধক্যে পরিণত হইতেছিল।

হে পরীক্ষাদেবী! তুমি বঙ্গদেশের ভদ্র সুসন্তানগণের প্রণাম গ্রহণ কর। তোমার কৃপা বিনা যে তাহাদের এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। তাহারা জাগরণে তোমাকে কাতরকণ্ঠে ব্যাকুলিত-প্রাণে আহ্বান করিতেছে। নিদ্রায় তোমার বিকট মূর্ত্তি গড়িয়া সম্মুখে রাখিয়া তোমার ধ্যান করিতেছে। তুমি তাহাদের তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে তুলিয়া লও। তুমি যদি তাহাদের পায়ে ঠেল, তবে তোমার চিন্তায় অকাল বার্দ্ধক্যে পরিণত যুবকদল আর প্রাণে বাঁচিবে না। কেহ রজ্জুকলসী লইয়া জলে যাইবে, কেহ কলসী বাদ দিয়া কেবলমাত্র রজ্জু লইয়া বৃক্ষশাখায় যাইবে, কেহ অহিফেন, এ্যাসিড্ প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিবে। যাহাদের প্রাণ কবজীমৎস্যের মত কঠিন, তাহারা প্রাণে বাঁচিবে, কিন্তু লোটাকম্বল সংগ্রহ করিয়া মাতৃভূমির নিকট চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়া জলস্রোতের মত কোথায় কোন এক সুদূর দেশে ভাসিয়া যাইবে। যাহাদের প্রাণে অধ্যবসায়ের বীজ রোপিত আছে, তাহারা সম্মুখ ভবিষ্যতে, দাসত্বখানার বড় বাবুর তিক্ত তিরস্কারের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে উঠিবার জন্য, হিমাদ্রীর মত অচল, অটল হইয়া, নবীন উৎসাহে, নবীন উদ্যমে, আবার তোমার ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া, শরীরটাকে অকালে মহাকালের করাল-কবলে নিক্ষেপ করিবে।

হে রাক্ষসী পরীক্ষা-দেবী! বাঙ্গলা প্রত্যহ প্রভাতে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় তোমার রাতুল-চরণে প্রণিপাত করে। তোমার অশেষ গুণ। তুমি শক্তিশালী যুবকদের অবলীলাক্রমে বলহীন করিয়া অকাল-বার্দ্ধক্যে পরিণত করিতে পার। তুমি দাসত্ব-প্রিয় স্ত্রীজাতির প্রভুদের দাসত্বের

বন্ধন আরও দৃঢ় করিয়া দিতে পার। তুমি গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মানের বাঁধন শিথিল করিয়া দিতে পার। তুমি আরও কত কি পার। তোমার চরণে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম।

নন্দকুমার সতীন্দ্রনাথকে তাহার পাঠাগারে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই, আনন্দাতিশয্যে জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম সতীশ বাবু! আজ এমন অসময়ে—"

কথাটা বলিতে বলিতে নন্দকুমার হঠাৎ থামিয়া গেল। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল, সতীন্দ্রনাথের মুখখানি বিষণ্ণ—মলিন—পাংশুবর্ণ। সে আর কথা কহিল না। সতীন্দ্রনাথ অতি ধীর অতি নিম্ন-কণ্ঠে, তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার বাবা কোথায়?"

নন্দকুমার উত্তর করিল, "আফিসে বোধ হয়।"

"আফিসে চলে গিয়েছেন?"

"বোধ হয়—আচ্ছা, বসুন. দেখি। ওরে, কে আছিস্ ও-ঘরে? বাবা আফিসে গিয়েছেন নাকি?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "না, এখুনিই যাচ্ছেন!"

নন্দকুমার সতীন্দ্রকে বলিল, "না, যাচ্ছেন—কেন বলুন ত?"

সতীন্দ্রনাথ নাতিদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অলসকণ্ঠে উত্তর দিল, "আর কেন!—সব শেষ হ'য়েছে!"

ভয়ব্যাকুলিত-কণ্ঠে নন্দকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"যতীন আর নেই" বলিয়া সতীন্দ্র কক্ষান্তরে নন্দের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

নন্দকুমার চেয়ারের উপর বসিয়া হাতে একখানা বই লইয়া পরীক্ষার পড়া পড়িতেছিল। সতীন্দ্রনাথের শেষ কথাটি শুনিবামাত্র তাহার হাত হইতে সশব্দে পুস্তকখানি মেঝের উপর পড়িয়া গেল। তাহার মাথা

বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরিতে লাগিল। মুখখানা সাদা মেঘে ঢাকা চন্দ্রমার মত ম্লান হইয়া গেল। বুকের মধ্যে ধপ্ ধপ্ ধ্বনি সশব্দে ধ্বনিত হইতে লাগিল। মাতালের মত তাহার সর্ব্বাঙ্গ টলিতে লাগিল। সে আর সোজা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। পার্শ্বের পালঙ্কের উপর গড়াইয়া পড়িল। মসিবর্ণ মেঘাচ্ছাদিত অমানিশার রাত্রির মত অন্ধকার তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিল। তাহাতে এককণা আলোকও দেখা গেল না। সে ভাবিতে লাগিল—বিধবার আবার শান্তি কি? তাহাদের শান্তি যে একজনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়া যায়! তাহাদের সমস্ত আনন্দ, সমস্ত উল্লাস তাহাদের স্বামী হারাণর সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়া যায়! জীবনে তাহারা শান্তি পায় সেই একদিন, যে দিন তাহারা স্বামীর কথা ভুলিয়া যায়—নিজের দেহখানার কথা ভুলিয়া যায়—সংসারের সকল কথা ভুলিয়া যায়! সেদিন তাহাদের বিরহের ভূমিকার বিসর্জ্জন হয়—মিলনের আনন্দ ডঙ্কা বাজিয়া উঠে!

১৪

তাহারাই আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু, বান্ধব, যাঁহারা অন্যের বিপদ নিজের বিপদ মনে করিয়া, সে বিপদকে লাঘব করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন।

যথাসময়ে নন্দকুমারের পিতা এবং সতীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত তাঁহার বাটী যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে নামিয়া, চন্দ্রনাথ বাবু একখানা নৌকা ভাড়া করিলেন। তিনজনে সেই নৌকায় উঠিলেন। নৌকা নঙ্গর উঠাইল—পাইল তুলিল।

বেলা দশ ঘটিকার সময় নৌকা চন্দ্রনাথ বাবুর বাটীর ঘাটে আসিয়া নঙ্গর করিল। তিন জনেই নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। মাঝির ভাড়া মিটান হইল। কলিকাতা হইতে গাড়ীতে উঠিবার পর হইতে

এ যাবৎ সময় ইঁহারা একরূপ নীরবেই ছিলেন। কেহ কাহারো সহিত বেশী কথা বলেন নাই। সকলের মনেই যে একটা দারুণ অশান্তি! কথা কহিবার প্রবৃত্তি থাকিলেও শক্তি কাহারো ছিল না। সুতরাং সকলেই নীরবে—অতি নীরবে—ভীষণ নীরবে কালক্ষেপ করিতেছিলেন।

বাটীর ঘাটে নামিয়াই চন্দ্রনাথ বাবু "মাগো" বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া বসিয়া পড়িলেন। নন্দের পিতা চন্দ্রনাথ বাবুর হাত ধরিয়া উঠাইতে উঠাইতে বলিলেন, "বেয়াই! আপনি এমন করলে চল্‌বে কেন? পুরুষ আপনি—পুরুষের মত হৃদয় কঠিন করুন। নারীর মত কোমল হৃদয় কি পুরুষের সাজে? ছিঃ, আর কাঁদ্‌বেন না। চুপ করুন।

ভারকণ্ঠে চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন, "চুপ্ কর্‌ব? বেয়াই! চুপ কর্‌ব? আমি চুপ কর্‌ব? আমি চুপ কর্‌ব সেই দিন, যে দিন আর আমি চীৎকার করতে পার্‌ব না—আমার কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ হ'য়ে যাবে! আমি চুপ কর্‌ব সেই দিন, যেদিন আর আমার নয়নে অশ্রু থাক্‌বে না—নয়নদ্বয় নিষ্প্রভ হ'য়ে যাবে! আমি চুপ কর্‌ব সেই দিন, যে দিন আমার হৃদয় অনুভবশক্তি হারাবে—অসাড়, নিস্পন্দ হ'য়ে পড়বে!"

"কাঁদ্‌তে ত চিরদিনই হবে বেয়াই! কিন্তু চীৎকার করে কেঁদে, অন্যকে কাঁদিয়ে লাভ কি? অশ্রু ফেলে অন্যকে দেখিয়ে তার অন্তরে ব্যথা দিয়ে লাভ কি? কেঁদে ত লাভ নেই বেয়াই।"

"জানি বেয়াই,—লাভ নেই! কিন্তু কি কর্‌ব? চোখের জল যে সাম্‌লাতে পারি না—কণ্ঠ যে আট্‌কে রাখ্‌তে পারি না,—বেয়াই! বেয়াই! চৌদ্দ পনের বছরের মেয়েকে বিধবা দেখে, কোন্ এমন পাষাণ পিতা আছে যে, চীৎকার না ক'রে থাক্‌তে পারে?—অশ্রু চেপে রাখ্‌তে

পারে? বেয়াই! চামেলী যে কিশোরী!" চন্দ্রনাথ বাবুর চোখের জল তীরবেগে ছুটিতে লাগিল। নন্দের পিতা অশ্রু মুছিলেন। সতীন্দ্রনাথ ছল ছল নেত্রে একটু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

শোকের দমকা একটু কমিলে নন্দের পিতা অনেক সান্ত্বনা বাক্যের দ্বারা চন্দ্রনাথ বাবুকে শান্ত করিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া, তাঁহার বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বাটীর নিকট আসিয়া নন্দের পিতা চন্দ্রনাথ বাবুকে বলিলেন, "বেয়াই! বাড়ীর মধ্যে কাঁদ্‌তে পার্‌বেন না। সবাইকে সান্ত্বনা বাক্যের দ্বারা শান্ত কর্‌বেন। আপনি কাঁদ্‌লে বাড়ীর সবাইকে যে, কিছুতেই শান্ত করা যাবে না!"

চন্দ্রনাথ বাবু সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন।

ঝটিকার পূর্ব্বে যেমন পৃথিবী কিয়ৎক্ষণের জন্য অত্যন্ত নীরব নিস্তব্ধ থাকে, চন্দ্রনাথ বাবুর বাটীতেও তেমনই একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। কোলাহল আদৌ ছিল না। বাটীতে অনেকগুলি পারাবৎ ছিল। তাহারা সম্মুখে অশান্তির ম্লানছায়া দেখিয়া কোথায় যেন গা' ঢাকা দিয়াছিল। তাহাদের রাত্রি-দিনের বক্‌বকুম-শূন্য শব্দ বাটীটাকে যেন আরও ভীষণ নিস্তব্ধতায় পরিণত করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে ভ্রমর-বিনিন্দিত কৃষ্ণপ্রস্তরের মত একটী কালো কাক বিকটস্বরে "খা' খা'" শব্দ করিয়া ভীষণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, নীরব হইয়া, আরও ভীষণ, আরও ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা আনিয়া দিতে ছিল। বাটীর পাচক, ভৃত্য ব্যতীত, পরিবার-ভুক্ত কাহাকেও দিবসে অথবা রজনীতে বাহিরে দেখা যাইত না। তাহারা সর্ব্বদা নীরব, অলস-ক্রন্দনে সময় অতিবাহিত করিতেন। বাটীটা লক্ষ্মীহীন শ্রীহীনের মত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

কুক্ষণে সেদিন রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল। চন্দ্রনাথ বাবু পিতা হইয়া কন্যার জন্য চমৎকার এক সু-খবর বহিয়া আনিতেছিলেন।

বাটীর অন্দরমহলের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াই চন্দ্রনাথ বাবু "মা গো! বাবাকে বিদায় দিয়ে এসেছি,—আর তাকে আন্‌ব না" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে টলিয়া পড়িতেছিলেন। নন্দকুমারের পিতা তাঁহাকে ধরিয়া বারান্দার চৌকির উপর বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, "বেয়াই! বাড়ীর কর্ত্তার এ সমস্ত দুঃখ কষ্ট যে অম্লানবদনে সহ্য কর্‌তে হয়! ঝড় বৃষ্টির মাঝে, ভয়ে যদি মাঝি হাল্ ছেড়ে দেয়, তবে কি নৌকা বাঁচে? আপনি বুদ্ধিমান্, আপনাকে ত বোঝাবার কিছু নেই; চুপ করুন, আর কাঁদ্‌বেন না। সবাইকে সান্ত্বনা দ্বারা শান্ত করুন।"

চন্দ্রনাথ বাবু নিজেই শান্ত হইতে পারিতেছিলেন না, সুতরাং অপরকে শান্ত করিবেন কি প্রকারে?

চন্দ্রনাথ বাবুর মর্ম্মভেদী ক্রন্দন শুনিয়া শ্যামাসুন্দরী আপন কক্ষ হইতে "বাবা গো" বলিয়া সশব্দে বারাণ্ডার সান-বাঁধান মেজের উপর টলিয়া পড়িয়া গেলেন। দর-দর-ধারে তাঁহার ললাট হইতে তপ্তরক্ত বাহির হইতে লাগিল। সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তিনি আর্জ্জ প্রাণের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া পৃথিবী-কম্পিত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যে চীৎকার,—যে ক্রন্দন, এতদিন ধরিয়া অবরুদ্ধ থাকিয়া দিবা-রাত্র ছট্‌ফট্ করিতেছিল, আজ তাহারা মুক্ত হইয়া মহানন্দে, মহোল্লাসে, মহাবেগে ধাবিত হইল।

সতীন্দ্রনাথ শ্বশ্রুমাতার ললাট হইতে রক্ত ছুটিতে দেখিয়া নিজ পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া, জলে ভিজাইয়া, তাঁহার ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিলেন।

জ্যেষ্ঠাকন্যা শেফালী দৌড়াইয়া আসিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর বক্ষের উপর

আছাড় খাইয়া পড়িয়া "বাবা! যতীনকে যে আন্‌তে গিয়েছিলে?" বলিয়া মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল।

"সে আস্‌ল না মা,—অভিমান ক'রে চ'লে গেল" বলিয়া চন্দ্রনাথ বাবু আরও বেশী কাঁদিতে লাগিলেন। নন্দের পিতা বলিলেন, "সবাই যদি এমন ভাবে কাঁদ্‌তে থাকেন, তবে চামেলীকে দেখ্‌বে কে?"

কেহ তাঁহার কথা কাণে তুলিল না। সকলেই আপন মনে কাঁদিতে লাগিল।

চামেলীর বড় ইচ্ছা হইল,—গগনভেদী চীৎকার করিয়া, চক্ষু দিয়া জলপ্রপাতের মত অশ্রু ফেলাইতে! কিন্তু সে পারিল না,—লজ্জার ভয়ে!

চন্দ্রনাথ বাবুর বাটীর মর্ম্মভেদী চীৎকার এবং আকুল ক্রন্দন শুনিয়া পাড়া-প্রতিবেশীগণ স্পষ্টই বুঝিল, যাহা হইয়াছে। প্রতিবেশিনীগণ স্ত্রীলোকদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য নিজ নিজ হস্তের কার্য্য ফেলিয়া রাখিয়া বড়বাড়ীতে দৌড়াইয়া আসিল।

চামেলীর গঙ্গাজল মীরারাণী, চামেলীকে সান্ত্বনা দিতে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। মীরারাণীকে দেখিয়া "মীরা! আমার কি হবে ভাই!" বলিয়া চামেলী তাহার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নীরবে অশ্রু ফেলিতে লাগিল।

চীৎকার করিয়া না কাঁদিলে কি আশা মেটে,—তৃপ্তি পাওয়া যায়? কিন্তু চামেলী সাধ মিটাইয়া কাঁদিতে পারিল না। মাতাপিতা অথবা অন্য কোন গুরুজন যদি তাহাকে কাঁদিতে শোনেন, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিবেন, সে তাহার স্বামীর জন্য কাঁদিতেছে। তখন হয় ত তাঁহারা তাহাকে "নির্লজ্জ—বিহায়া" ভাবিবেন।

হায় রে হিন্দুনারীগণ! স্বামীই যে তোমাদের আরাধ্য দেবতা! স্বামীর মৃত্যুতেই যে তোমাদের মৃত্যু! তবে কেন তোমাদের স্বামীতে এত লজ্জা!

নন্দের পিতার বার বার নিষেধে চন্দ্রনাথ বাবু চুপ করিলেন,—অশ্রু মুছিলেন—স্থির হইলেন। তখন নন্দের পিতা তাঁহাকে বলিলেন, "চামেলীকে ডাকুন।"

চন্দ্রনাথ বাবু "মা" বলিয়া আবার শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিজেকে সংযত করিয়া ধীরকণ্ঠে ডাকিলেন, "মা চামেলি!"

চামেলী পিতার আহ্বান শুনিল, কিন্তু উত্তর দিতে পারিল না। কণ্ঠ আপনার অজ্ঞাতসারে রুদ্ধ হইয়াছিল। ইচ্ছা সত্ত্বেও সে উত্তর দিতে পারিল না। স্বর কোন মতেই বাহির হইল না। কেবল তীরবেগে অশ্রু বাহির হইতে লাগিল।

চন্দ্রনাথ বাবু আবার ডাকিলেন, "চামেলি! মা আমার!"

তথাপি চামেলীর কণ্ঠ সরিল না। সে অশ্রু মুছিয়া গণ্ড শুষ্ক করিয়া পিতার নিকট আসিতে প্রস্তুত হইল, কিন্তু অশ্রু আবার তেমনি ভাবে পড়িতে লাগিল। পিতার বার বার আহ্বান সত্ত্বেও সে তাহার পিতার নিকট যাইতে পারিতেছিল না দেখিয়া তাহার বড় লজ্জা হইল। সজল-নয়নে নিমিষের মধ্যেই মরণের প্রার্থনা, সে ভগবানের নিকট করিল। কিন্তু মরণ আসিল না। আসিবে কেন? সে যে বিধবা! বিধবার কি সহসা মরণ হয়? বিধবার যদি শীঘ্র মরণ হইবে, তবে জীবনের সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভীষণ কষ্ট, দারুণ দুঃখ সহিবে কে?

নন্দের পিতার কথায় চন্দ্রনাথ বাবু কক্ষের অভ্যন্তর হইতে চামেলীকে লইয়া আসিয়া আপন ক্রোড়ে বসাইলেন। চামেলী মুখ উত্তোলন করিতে পারিল না। পিতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া রাখিল।

শোকের ক্রন্দন, চীৎকার কিয়ৎপরিমাণে কম পড়িল। প্রতিবেশিনী-গণ নিজ নিজ শোকপ্রাপ্তির কথা এবং তাহা অম্লানবদনে সহ্য করিবার কথা বলিয়া শ্যামাসুন্দরীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে

জনৈকা বৃদ্ধা নারী বলিলেন "আমার চার ছেলের মধ্যে একটীও নাই মা। তবু ত আমি হেসে খেলে বেড়াচ্ছি। জানি, তারা আমার না, কাজেই তাদের জন্য কেঁদে লাভ কি? কাঁদলে ত তাদের ফিরে পাব না? আমার যদি তারা হ'ত তবে কি তারা আমাকে ছেড়ে যেতো?" অপরা নারী শ্যামাসুন্দরীকে কহিলেন, "দিদি! ও তোমার শত্রু ছিল!" আর একটী স্ত্রীলোক বলিলেন, "আমার সাত সাতটি মেয়ে—সাতটিই বিধবা—জান ত বৌ? কর্‌ব কি?—মানুষের কর্‌বার আছে কি? মানুষের ইচ্ছায় কি কাজ হয়? যিনি কর্‌নেয়ালা, তিনিই যা' কর্‌বেন—তাই আমাদের মাথা পেতে মেনে নিতে হবে।"

১৫

চামেলী স্নান করিয়া আসিয়া উঠানের এক কোণে দাঁড়াইল। সিঁথিতে সিন্দুর নাই—সিঁথি শুভ্র। হাতে খাড়ু-শাঁখা নাই—হাত নাড়া নাড়া। পরিধানে রঙ্গিন পাড়ের কাপড় নাই—সাদা থানফাড়া ধুতি। পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্কা যুবতী—মুখে কোন লাবণ্য নাই—অঙ্গে কোন সৌন্দর্য্য নাই—মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে—অঙ্গ মরাগাছের মত কদাকার। মুখে একবিন্দু হাসি নাই—মলিন বিষণ্ণ। কি করুণ দৃশ্য! এমনি ভাবে তাহার সুদীর্ঘ জীবনের সময় অতিবাহিত করিতে হইবে। এ দৃশ্য কি মানুষ মানুষের দেখিতে পারে?

হায় রে বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ! নির্ম্মম নিষ্ঠুর সমাজ! একবার দেখে যাও! বিধবাদের মুখের পানে এসে একটু তাকিয়ে থেকে দেখে যাও! বুকের ভিতর ত' চাইতে পার্‌বে না—বুকের মাঝে যে কি ঝড় বইছে—তা'ত বুঝ্‌তে পার্‌বে না, কিন্তু মুখের পানে যদি ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখ—তবে দেখ্‌বে—হৃদয়ের মধ্যে যে জ্বলন্ত অনলের ঝাপ্টা বইছে—তা'

মুখে কিছু প্রতিফলিত হয়েছে! এ যে তোমারি কীর্ত্তি! স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ দেখি—এ দৃশ্য কতক্ষণ দেখ্‌তে পার? কি, দেখ্‌বে না? এ দৃশ্য দেখ্‌বে না? তা' দেখ্‌বে কেন? দেখ্‌লে যদি করুণার উদ্রেক হয়—দেখ্‌লে যদি হঠাৎ মনটা নরম হ'য়ে যায়—চ'খে জল আসে—তবে ত নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার দণ্ড ঘুরাণ যাবে না—তবে ত অত্যাচারী ব'লে জগতের হেয়ত্ব লাভ করা যাবে না—তবে ত জগতের বিদ্রূপ ব'লে ঘৃণিত হওয়া যাবে না! হে পুরুষ-স্বাধীন সমাজ! নারী শিশুর মত দুর্ব্বল অসহায় ব'লে তুমি তাদের ওপর তোমার নিষ্ঠুর স্বাধীনতার দণ্ড অবাধে ঘুরিয়ে নিয়ে যেয়ে, তাদের চির-পরাধীন ক'রে, টুঁটি টিপে ধ'রে রেখেছ—পাছে ছিট্‌কে যায় ভেবে! হে বাঙ্গালার সমাজ! তুমি দুর্ব্বলকে অনায়াসে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে, তাদের বুকের ওপর পাষাণ চাপিয়ে রাখ্‌তে পার, কিন্তু বলবান্‌কে পরাধীনতার জালে ঘের দেখি, অথবা তাদের মত বুকটান ক'রে, তাদের সম্মুখ দিয়ে চল দেখি! সে সময় তুমি বার্দ্ধক্যের দোহাই দিয়ে, ইতস্ততঃ চাইতে চাইতে, দু'এক পা' ক'রে পিছু হাঁটবে। তোমার যৌবনশক্তি, যুদ্ধলালসা হৃদপিণ্ড হ'তে লাফিয়ে ওঠে বুঝি তখন—যখন তুমি তোমার সাম্‌নে নিরীহদের দেখ—যারা তোমার নিকট তোমারই চাটুবাক্যে বহুদিন পূর্ব্বে আত্মসমর্পণ করেছে! আশ্রিত-জনের প্রতি এত নিষ্ঠুর অত্যাচার, এত নির্ম্মম অবিচার,—একি ধর্ম্মে সয়? সয় না। তাই তোমার সমাজের এত অধঃপতন। হে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ! জগতের মাঝে বিদ্রূপ সেজে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে তোমার লজ্জা হ'চ্ছে না? ওরে ঘৃণিত, পরপদদলিত সমাজ! অন্যের উজ্জ্বল গৌরবের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে, অতীত গৌরবে গৌরবান্বিত হ'তে তোমার চক্ষে জল আস্‌ছে না?—বাক্‌রোধ হ'চ্ছে না? ঘৃণায় মাটির মধ্যে সেঁধোবার ইচ্ছে হ'চ্ছে না? ওরে দয়াহীন,—মায়াহীন,—অনুকম্পাহীন,—সারহীন সমাজ! কবে তোমার

মৃত্যু হবে? কবে তোমার অধীনস্থ প্রজারা বুকফাটা তৃপ্তির অট্টহাসি হেসে পৃথিবী প্রকম্পিত ক'রে মহোল্লাসে নৃত্য করবে? কবে গভীর গর্জ্জনে গগন বিদীর্ণ করে, সুপ্তকে জাগিয়ে দিয়ে, আবার তারা প্রাণখুলে হাস্‌তে শিখ্‌বে?

"নিরপরাধে অপরাধিনী বিধবাদল! একবার সহস্রমুখে সর্ব্বান্তঃকরণে, এই হৃদয়হীন পাষণ্ড সমাজকে অভিশাপ দেওত! না, না, অভিশাপে বিশেষ কিছুই হবে না। এতদিন ধরে ত' অভিশাপ দিয়ে এসেছ,—সে অভিশাপে সে সারশূন্য হ'য়েছে,—মরেনি,—মরবে না,—এম্‌নি সারশূন্য থাক্‌বে। যদি এর নাম জগৎ থেকে বিলুপ্ত করতে চাও, তবে ভগবানের কাছে আকুলিত ভাবে কেঁদে কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা কর। না, না, তা'তেও বিশেষ কিছু ফল হবে না,—ঐশী করুণার দ্বার যে রুদ্ধ!

"হে ব্যথিত সন্তাপিত বিধবাদল! অসহায় শিশুর মত গৃহকোণে বসে নীরবে অশ্রুজলের পারাবার সৃষ্টি করলেও কেউ একবিন্দু করুণা দান করবে না,—কুকুরের মত প্রভুভক্ত পদলেহী হ'লেও কেউ এককণা সহানুভূতি দেখাবে না,—ক্ষুধার্ত্তের কণ্ঠের মত হৃদয়স্পর্শী-কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করলে, কেউ এক লহমার জন্যও ফিরে তাকাবে না। তবে একবার মনটাকে হিমাদ্রীর মত অচল অটল ক'রে, হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তিগুলিকে বলি দিয়ে, ক্রোধ-বহ্নিকে বাতাস দিয়ে, হিংসার মত অন্ধ হ'য়ে, নিয়তির মত নিষ্ঠুর হ'য়ে, মৃত্যুর মত পাষাণ হ'য়ে, ঈশ্বরের মত নির্দ্দয় হ'য়ে, শয়তানের মত ক্রূর হ'য়ে, অসুরনাশিনীর মূর্ত্তি ধ'রে, হুঙ্কার দিয়ে, বদ্ধ-পরিকর হ'য়ে দাঁড়াও ত! একবার অগ্নির মত জ্ব'লে উঠে, প্রলয়ের মেঘ-গর্জ্জনের মত ঘনঘোর গর্জ্জন ক'রে, ভূমিকম্পের মত কাঁপিয়ে, ঝঞ্ঝার মত আলোড়িত ক'রে, বন্যার মত এই সমাজটাকে ডুবিয়ে ধ্বংস ক'রে দিয়ে, গগন খান্ খান্ করা একটা অট্টহাসি হাসত।—কি, নীরব! পারবে না? পারবে

না? তবে এমনিভাবে জ্বল,—ভোগ কর। নীরবে গৃহকোণে ব'সে কাঁদ, অশ্রুজলে সাগর তৈরী কর, নীরব আর্ত্তনাদে আপনি কেঁপে উঠে ফেটে পড়, নীরব হাহাকারে আপন বক্ষ বিদীর্ণ কর, হাসি ভুলে যাও, কথা বল্‌তে ভুলে যাও, আহার ভুলে যাও, বিহার ভুলে যাও, লবণাক্ত ক্ষত-স্থানের জ্বালার মত জ্বালা অহোরাত্র সহ্য কর,—কেবল কাঁদ,—রাত্রিদিন কেবল কাঁদ।"

স্নান করিয়া যখন চামেলী বিষাদক্লিষ্ট-আননে প্রাঙ্গণের এককোণে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বাঁধ-ভাঙ্গার মত আবার ক্রন্দনের রোল দ্বিগুণ বেগে উঠিল, হাহাকার আর্ত্তনাদ আবার গগন বিদীর্ণ করিয়া ঐশী করুণার রুদ্ধদ্বারে ধাক্কা খাইয়া আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইল।

১৩

নন্দকুমারের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ফিয়ের টাকা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া এবং বন্ধুবর্গের অনুরোধে সে অনিচ্ছাসত্ত্বে পরীক্ষা দিল। তাহার মনে ছিল—দারুণ অশান্তি—একটা অদৃশ্য অসহ্য বেদনা। নিদ্রায় জাগরণে কেমনই একটা হাহাকার সে অনুভব করিত। সে অনেক বিধবা দেখিয়াছে, অনেক বিধবার দুর্দ্দশা শুনিয়াছে, অনেক বিধবার দুঃখ-কাহিনী শুনিয়াছে, কিন্তু কোন কাহিনী অথবা কোন বিধবার করুণ-দৃশ্য তাহাকে এম্‌নি ভাবে অবশ, অলস, অসাড়, অশান্ত করিতে পারে নাই।

যথাসময়ে নন্দকুমারের পরীক্ষা শেষ হইল। পরীক্ষায় সে ভাল লিখিতে পারিল না। পরীক্ষা-শেষে তাহার পিতা তাহাকে তাহার শ্বশুরালয়ে যাইতে আদেশ করিলেন।

এক দিন ছিল, যে দিন শ্বশুর বাড়ী যাইতে তাহার কত আনন্দ, কত উল্লাস হইত, কিন্তু আজ? আজ যে তাহার যাইতে বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা

হইতেছে না। কি করিয়া, কোন্ মুখে সে সেথানে যাইবে? যেথানে সে সদাসর্ব্বদা শ্যালিকা-পরিব্যাবৃত হইয়া সঙ্গীতের লহর তুলিয়াছে—হাস্যের ফোয়ারা ছুটাইয়াছে—আনন্দের প্রস্রবণ বহাইয়াছে—প্রেমকথার উৎস জাগাইয়াছে—ক্রীড়ার বন্যা আনাইয়াছে—মান অভিমানের তুফান ফুটাইয়াছে—আজ সেথানে কোন্ প্রাণে ক্রন্দনের রোল—আর্ত্তনাদের চীৎকার—হাহাকারের হা হতোস্মি—দুঃখের উষ্ণশ্বাস শুনিতে যাইবে? কোলাহলের পরিবর্ত্তে নীরবতা—হাসির পরিবর্ত্তে কান্না—আনন্দের পরিবর্ত্তে কষ্ট—শান্তির পরিবর্ত্তে শোক—সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ কেমন করিয়া সে সহ্য করিবে?

সে স্থির করিল—সে যাইবে না। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করিল—না যাওয়া উচিত নয়। বিপদে যাহারা বুক আগাইয়া দাঁড়ায়—তাহারাই—বন্ধু। সান্ত্বনা দ্বারা শান্ত করাই বন্ধুর কার্য্য। আত্মীয় স্বজন কুটুম্বই বন্ধু। সুতরাং এখন তাহার যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

হিন্দু-বিধবার জীবন-পথটা বড়ই আঁকাবাঁকা। সেই আঁকাবাঁকা পথটী কোথায়ও উন্মত্ত তরঙ্গায়িত নদী পার হইয়া গিয়াছে—কোথায়ও ভীষণ আঁধারাবৃত গহ্বরের অন্তরদেশ দিয়া গিয়াছে—কোথায়ও আলোকরহিত গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে। সে পথে আলোকের রশ্মি নাই—আছে নিবিড় অন্ধকার; সে পথে জনমানবের সাড়া নাই—আছে হিংস্র জন্তুর ভৈরব গর্জ্জন; সে পথে আশীর্ব্বাদ নাই—আছে অফুরন্ত অভিশাপ; সে পথের পথপ্রদর্শক কেউ নেই—যে আছে, সে প্রলোভন, উন্মত্ত প্রলোভন। তাহাকে এক লহমার জন্য বিশ্বাস করিলেও নারীর সর্ব্বস্ব ধন চিরতরে নষ্ট হইয়া যায়।

সমাজ কোন্ গুরুতর অপরাধের জন্য বিধবাদের এমন আঁকাবাঁকা-পথে যা জীবন চলিতে শাস্তিবিধান করিয়াছেন? কে তাহার উত্তর

দিবে ? তাহারাও আতঙ্কে মুখ পাংশুবর্ণ করিয়া কম্পিত-কলেবরে অবনত-মস্তকে অজ্ঞাত অপরাধের শাস্তি ভোগ করিতেছে ! প্রতিবাদ করিতেছে না। তাহারা যেন সংসারের কেহই নয়—এ পৃথিবীতে আপনার বলিতে তাহাদের যেন কেহই নাই—তাহার জন্যই তাহারা অতি ম্লান-মুখে দীন দরিদ্রের অপেক্ষাও হীন, অতি হীনভাবে শাস্তি-ভোগ করিতেছে। দীন দরিদ্রের কে আছে ? আছে—দীন দরিদ্রের সেই দীনবন্ধু ভগবান আছেন। তাহাদের আশা আছে—ভরসা আছে—দীনবন্ধু যে তাহাদের দিকে চাহিয়া আছেন! কিন্তু বিধবাদের কে আছে ? কেহই নাই—ভগবান তাহাদের উপর বিমুখ—মাতা পিতা ভ্রাতা পর্য্যন্ত তাহাদের দিকে একবার এক লহমার জন্যও চাহিবার অবসর পান না—চাহিবার অবকাশ পাইলেও মুখ ফিরাইয়া থাকেন—চাহিতে ইচ্ছা করেন না।

কাঁদ—কাঁদ অভাগিনীর দল প্রাণ ভরিয়া কাঁদ—দেখ—শান্তি পাও কি না ? দেখ—তৃপ্তি পাও কি না ? জনকজননী যাহাদের প্রতি ফিরিয়া চাহিতে কাঁপিয়া ওঠেন, তাহারা কাঁদিবে না ? কাঁদিতে যাহাদের জন্ম—কাঁদিতে যাহাদের কর্ম্ম—কাঁদিতে যাহাদের মৃত্যু—তাহারা কাঁদিবে না ?

নন্দকুমার অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে স্থির করিল—সে যাইবে। যাইয়া তাহার মধ্যম শ্যালিকার শোকের লাঘব করিতে, যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, একটু আপনার হইয়া দাঁড়াইবে! বিধবাদের যে কেহ নাই! সকল কর্ত্তৃকই যে তাহারা পরিত্যক্তা! মাতাপিতা পর্য্যন্ত তাহাদের ত্যাগ করিয়া প্রলোভনের রাজ্যে ছাড়িয়া দিয়া থাকেন। তাহাদের দুঃখের কথা শুনিবার যে কেহই নাই। দুঃখের কথা বলিয়া প্রাণে একবিন্দু শান্তি পাইবে, এমন কাহাকেও ভগবান তাহাদের জন্য সৃজন করেন নাই। তাহারা যে ভগবানের অভিশাপ—সমাজের অস্পৃশ্য—মাতাপিতার পরিত্যক্ত !

১৭

শোকের হাহাকারের আর্ত্তনাদের ক্রন্দনের গগন বিদীর্ণ করা করুণ-চীৎকারধ্বনি নীরব হইল, কিন্তু হৃদয়ের অদৃশ্য অসহ্য বেদনা, নীরব অশ্রুজল থামিল না। শ্যামাসুন্দরী কন্যার দুরদৃষ্টের চিন্তায় অর্দ্ধোন্মত্ত হইলেন। কখনও তাহার রীতিমত জ্ঞান থাকিত—কখনও তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ হইতেন। যখন তাঁহার জ্ঞান থাকিত, তখন তিনি কিছু আহার করিতেন না এবং নিদ্রাও যাইতেন না, কেবল বসিয়া পড়িয়া একমনে কাঁদিতেন। যখন জ্ঞান না থাকিত, তখন তিনি চামেলীকে লইয়া বসিয়া কত কথা কহিতেন—কত হাসি হাসিতেন। বিবাহের কন্যার মত, স্বহস্তে কন্যার সর্ব্বগাত্রে অলঙ্কার পরাইয়া, পায়ে আল্‌তা দিয়া, গন্ধ তৈল দ্বারা চুল আঁচড়াইয়া বাঁধিয়া, মূল্যবান্ সেমিজ, ব্লাউজ্, সাড়ী পরাইয়া দিয়া অট্টহাসি হাসিতেন। তাঁহার সম্মুখ হইতে কন্যাকে সরাইতে দিতেন না; এবং তাহার গাত্রের অলঙ্কার খুলিতে দিতেন না। গাত্র হইতে অলঙ্কার খুলিলে ক্রোধাবৃত-মুখে রুদ্ধশ্বাসের মত নীরব নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন—আবার কখনও কখনও শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া কন্যাকে প্রহার করিতেন। জ্ঞান অবস্থাতেও তিনি কখনো কন্যাকে নিরাভরণা করিতে দিতেন না।

সে দিন প্রাতঃকালে চামেলীর 'গঙ্গাজল' মীরারাণী চামেলীকে লইয়া তাহাদের বাটীতে যাইতেছিল। পঞ্চদশবর্ষীয়া বিধবা চামেলীর সর্ব্বগাত্র অলঙ্কারে সজ্জিত ছিল।

যে পথ দিয়া তাহারা যাইতেছিল, সেই পথ দিয়া গ্রামের কয়েকটী কুলবধূ শূন্য-কলসী কাঁখে লইয়া নদীতে স্নানে চলিয়াছিল। চামেলীকে দেখিয়া তাহারা সতৃষ্ণ-নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া নিশ্চয়ই

একটা কিছু লক্ষ্য করিতেছিল। চামেলী তাহা দেখিয়া লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া নীরবে মীরার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

সেই বধূগণের মধ্যে রাঙ্গাবধূ সতৃষ্ণ-নয়নে চামেলীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—"আঃ, দেখনা—ছুমড়ো রাঁড় চলেছেন। সাজগোজ ক'রে লোকের সন্ধানে বেরিয়েছেন।"

চামেলী সে-কথা শুনিল। তাহার বোধ হইল—মাটি ভেদ করিয়া একটা উষ্ণ বাতাস উঠিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ অগ্নির মত পোড়াইয়া দিয়া আকাশে চলিয়া গেল। তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। সে আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। বড় লজ্জায়, বড় ঘৃণায়, বড় দুঃখে, বড় ক্ষোভে সে ফিরিয়া দ্রুত গৃহে চলিল।

রাঙ্গাবধূ আবার বলিল, "দেখনা, হাঁটিবার ভঙ্গি,—যেন ওর কিছুই হয়নি। হবেই বা কি? বড় ঘরের মেয়ে—ভাতার মরেছে—তলে তলে আর একটা নূতন কাড়াতে কতক্ষণ? এমন তেমন কিছু হ'ল—টাকার ত অভাব নেই—কাশী-টাশী এক জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে খালাস ক'রে নিয়ে এল।"

এই ঘৃণিতা নিষ্ঠুরা নারীর কথায় বধূদের মধ্যে কেহ মুচ্‌কী হাসিল, কেহ চামেলীর দিকে তাকাইয়া রহিল, কেহ অবাক্ হইয়া রাঙ্গাবধূর মুখের উপর একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মীরারাণী ক্রোধে গণ্ড রক্তবর্ণ করিয়া রাঙ্গাবধূর দিকে রোষরক্তিম-কটাক্ষে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া ক্রোধ-কম্পিত-স্বরে একবার মাত্র বলিল—"রাঙ্গাবৌ!" অত্যধিক ক্রোধবশতঃ সে আর কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার পর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, চামেলীর বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হায় হিন্দু-নারী! তোমরা আজ এত নীচ পাষণ্ড হইয়া গিয়াছ!

একদিন তোমাদের গৌরব দেশে দেশে স্বর্গীয় মন্দার পুষ্পের সৌরভের মত ভাসিয়া বেড়াইত, আর আজ? সে কথা ভাবিতে গেলে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়—চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। কি সুন্দর—কি চমৎকার অধঃপতন। কে তোমাদের এমন সর্ব্বনাশ করিল? পুরুষ? নাঃ; তোমাদের এ অধঃপতনের কারণ,—তোমরা নিজেরা! তাহা না হইলে তোমাদের জাতির কাহারো দুঃখে তোমরা দুঃখিত না হইয়া হাসিয়া তাহার হৃদয়ে আরও বেদনা দিতে পার? জাতির কাহারও দুঃখে সমব্যথিত না হইয়া, সে দুঃখের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া, জড়ের মত বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি?

মীরারাণীর হৃদয়ে বড় ব্যথা বাজিল। আজ তাহার জন্যই তাহার গঙ্গাজলের এমন নিষ্ঠুর কথা শুনিতে হইল। সে যদি তাহাকে তাহাদের বাটীতে লইয়া না যাইত, তবে ত তাহার গঙ্গাজলের, সেই হীন পাষণ্ড নারীর—যে নারীর দর্শনে পাপ, স্মরণে অপবিত্রতা, স্পর্শনে অনন্ত নরক-ভোগ—এমন অস্পৃশ্য-নারীর হৃদয়বিদারক কথা শুনিতে হইত না।

মীরারাণী চামেলীদের বাটীতে প্রবেশ করিয়া চামেলীর কক্ষে গিয়া দেখিল—মেঝের ধূলার উপর চামেলী শুইয়া পড়িয়া, মুখ মেঝেতে লুকাইয়া, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। পার্শ্বে তাহার মাতা বসিয়া তাহার নিকট, তাহার ক্রন্দনের কারণ বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু সে উত্তর দিতেছে না।

মীরাকে সে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ মীরা! চামেলী কাঁদে কেন? এই যে তোর সঙ্গে এই মাত্র গেল—এর মধ্যে তোদের মধ্যে হ'ল কি? তুই কিছু বলেছিস্ নাকি?"

মীরা কম্পিত-কণ্ঠে কহিল, "না মা, আমি কিছু বলিনি; ও-পাড়ার রাঙ্গাবৌ কি যেন বলেছে।"

"কি বলেছে ?" রাত্রিতে ব্যাঘ্রের চক্ষু যেমন জ্বলে, শ্যামাসুন্দরীর চক্ষু তেমনি ভাবে জ্বলিতে লাগিল।

মীরা ভীত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শ্যামাসুন্দরীর কথার কোন উত্তর দিল না। তিনি গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বল্, কি বলেছে।"

মীরা ভীত-কম্পিতস্বরে বলিল, "কাপড়, গহনা পরা দেখে, কি কি যেন বলেছে।"

অল্প পরিমাণে আহত সিংহের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া, শ্যামাসুন্দরী কহিলেন, "কি ! আমার মেয়েকে আমি যা' ইচ্ছা তাই পরাব—তা'তে অপরের কি ?"

ক্রন্দন-কম্পিতকণ্ঠে চামেলী কহিল, 'অপরে যা' দেখ্‌বে, তাই বল্‌বে—তা'তে তোমারই বা কি ? বল্‌বে—বেশ কর্‌বে। বল্‌বে না ? সে ত মিথ্যা কিছুই বলে নি—যা দেখেছে, তাই বলেছে। আমি বিধবা, আমার কপাল পুড়েছে—আমার কপাল হ'তে এসব উঠে গিয়েছে—তুমি জোর ক'রে ধ'রে রাখ্‌লে কি হয় ?"

চামেলী বড় দুঃখে, বড় ব্যথায় এই কয়েকটী কথা কহিয়া ফেলিয়া, নিজেও অনেক কাঁদিল, মাতার মনে ব্যথা দিয়া তাঁহাকেও অনেক কাঁদাইল। মাতা এবং কন্যা কাঁদিল—আর কেহ কাঁদিল না—আর কেহ এমন ব্যথা অনুভব করিল না। বাঙ্গালায় একের কান্নায় অন্যের চক্ষে জল আসে না, যে জল আসে, সেটা লোক দেখান—একের ব্যথায় অন্যে ব্যথিত হইতে জানে না; বেদনাসূচক শব্দ করে বটে, কিন্তু সেটা মৌখিক।

শ্যামাসুন্দরী কন্যার কথায় কাঁদিলেন, অনেক কাঁদিলেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল, অসুর-নাশিনীর মত সমাজ-নাশিনী হইতে। কিন্তু তিনি পারিলেন না—তিনি যে একা, বড় একা; এই এত বড় বিশ্বে তাঁহার সহায়

তাঁহার বিধবা কন্যা ব্যতীত আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না। নারীর ব্যথা নারী বোঝে না, নারীর সহায় নারী হইতে চাহে না। নারী পুরুষের কুমন্ত্রণায় শয়তানের অপেক্ষাও ক্রুর হইয়া নারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে একটু দ্বিধা করে না অথবা একটু কাঁপে না।

গভীর হতাশ্বাসে অনেক কাঁদিয়া, শ্যামাসুন্দরী ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া, "তোর আর বসন-ভূষণ পর্‌তে হবে না" বলিয়া চামেলীর গাত্র হইতে মূল্যবান্ বসনগুলি লইয়া, আগুন দিয়া ভস্মসাৎ করিলেন, ভূষণগুলি দূরে নিক্ষেপ করিলেন—কোনখানি বেঁকিল, কোনখানি ভাঙ্গিল। স্থির-নয়নে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত বসন-ভস্ম এবং অলঙ্কার-চূর্ণের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, কন্যার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া তিনি পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া চামেলীও কাঁদিতে লাগিল। মীরারাণী কক্ষের একপার্শ্বে অচল অসাড়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া, নীরবে সেই করুণদৃশ্য দেখিল—কাঁদিল না—রাঙ্গাবধূকে প্রাণের তৃপ্তির সহিত অভিশাপ দিল।

বেলা অনেক হইল। সেই বৃদ্ধা তাহার অন্ধ-পুত্রের হাত ধরিয়া ভিক্ষার জন্য বড়বাড়ীর অন্দর-প্রাঙ্গণে আসিবামাত্র একটী ঝি রুক্ষকণ্ঠে তাহাদের বলিল, "হ্যাঁগা, তোমাদের আক্কেল আছে?"

বৃদ্ধা কোমলকণ্ঠে উত্তর দিল, "কেনেগা, কি হ'য়েছে?"

"কেন জান না—বাবুর মেজো জামাইটা মারা গিয়েছে, বাড়ীর সবাই কাঁদাকাটা কর্‌ছে? এই অশান্তির মধ্যে এ বাড়ীতে তোমাদের ভিক্ষা কর্‌তে না এলে হোলো না?"

"তা'ত জানি না মা; আচ্ছা যাচ্ছি।" এই বলিয়া বৃদ্ধা তাহার পুত্রের হাত ধরিয়া অন্যস্থানে ভিক্ষা-সংগ্রহের জন্য যাইতে লাগিল।

চন্দ্রনাথ বাবু অন্দরের এক বারান্দায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন এবং স্থির-নয়নে কন্যার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিলেন। বৃদ্ধা ভিক্ষুক

এবং বাটীর ঝির কথোপকথন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা, অন্ধ-পুত্রের হাত ধরিয়া, যখন অন্দরের উঠান পার হইয়া গেল, তখন তিনি মৃদুস্বরে ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা! মানুষ হ'য়ে, কেন মানুষকে নিরাশ ক'রে তার প্রাণে ব্যথা দাও? নিরাশার কি দারুণ বেদনা, তা' কি জান না মা? নিরাশ কর্‌বার অধিকারী—একমাত্র ভগবান: তাঁকেই সে কাজ কর্‌তে দেও। তোমরা মানুষ, তোমরা কোরো না। ডাক ভিক্ষুককে, ডেকে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে ভিক্ষা দেও। ভিক্ষাপ্রার্থী তারা, তাদের ভিক্ষা না দিয়ে কি তুমি প্রাণে শান্তি পেয়েছ? তা'ত পাওনি মা! যাও মা! আর কাউকে নিরাশ কোরো না।"

দুই ফোঁটা তপ্ত-অশ্রু ঝিয়ের নয়নদ্বয় দিয়া উচ্ছলিত হইয়া পড়িল। সে বেশ বুঝিল—কেন বাবু তাহাকে কাহাকেও নিরাশ করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের মধ্যেও যে নৈরাশ্যের দারুণ হাহাকার দিবারাত্র থা থা করিতেছে। তিনি যে বড় আশা করিয়াছিলেন—আগামী ষষ্ঠীপূজায় তিন জামাতাকে একত্র করিবেন। কিন্তু আশা তাহার পূর্ণ হইল কৈ! কে তাঁহার আশার আলোক নিরাশার গাঢ় আঁধার দিয়া ডুবাইয়া ফেলিল!

অনুতপ্ত-হৃদয়ে ঝি নয়নের বারি মুছিয়া ভিক্ষুকদ্বয়কে ফিরাইয়া আনিল। তাহাদের দুই জনের একদিনের উপযুক্ত আহারীয় দ্রব্য দিতে তিনি ঝিকে অনুমতি করিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু অন্ধ ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গাইতে জান?"

বৃদ্ধা ভিখারিণী উত্তর দিল, "হ্যাঁ, পারে; গাও ত বাবা।"

অন্ধ ভিক্ষুক খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে গাহিল—

কেঁদো না কেঁদো না মা গো,
কাঁদিলে কি তারে পাবে?

যখন যাহার সময় হবে
তখন সে চলে যাবে ।

যে কর্ম্ম সাধিবারে,
ভবে আসে নরে,
কর্ম্ম তাহার সাঙ্গ হ'লে,
যায় চলে মা, যায় চলে ।

দু'দিন ভবে এসেছিল,
মা' ব'লে মা ডেকেছিল,
স্নেহ ভক্তি ক'রেছিল,
এখন সে চলে গেল,
তোমায় একা ফেলে ভবে ।

দু'দিনের মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে
বক্ষে তারে ধরেছিলে,
যখন মায়া কেটে গেল চলে,
যাও মা তারে যাও ভুলে ।

যদি ভাল বেসে থাক,
তার তরে কেঁদো না'ক,
সে যে সংসার ছেড়ে আছে ভাল,
যায় না সেথা দুখের আলো,
সুখের আলো বিরাজিত,
সেথা সবার মিলন হবে ॥

গান শেষ হইল। ঝি ভিক্ষা দিল। বৃদ্ধা অন্ধ পুত্রের হাত ধরিয়া আপন গৃহাভিমুখে গমন করিল।

চন্দ্রনাথ বাবু বসিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—জন্ম হইলেই মৃত্যু অনিবার্য্য। তবে কেন মানুষ মানুষের মৃত্যুতে কাঁদে? প্রত্যেকেই

জানে—কাঁদিয়া কোন লাভ নাই—মৃত্যুমুখে পতিত-জন ফিরিয়া আসে না, তবে কেন অকারণ মানুষ কাঁদে ?

ভিক্ষুকদ্বয় যাইবার কিঞ্চিৎ·পরেই, শ্যামাসুন্দরী সহসা সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া, অতি অল্পসময়ের মধ্যে আপনার বাক্স হইতে নিজের গহনাগুলি বাহির করিয়া, পুনরায় সেই কক্ষে উন্মত্তের মত প্রবেশ করিয়া কন্যাকে গহনাগুলি পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "আজ থেকে আর তোকে কোথায়ও যেতে দেব না। বাহ্যি প্রস্রাব, খাওয়া শোওয়া সব কাজই এই ঘরে ক'র্‌বি। দেখি—কে তোকে দেখে, কে তোকে কি বলে ?" এই বলিয়া তিনি ঝড়ের মত সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মীরারাণী লজ্জায় চামেলীর সহিত কোন কথা কহিতে পারিল না। চোরের মত ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া নিজ বাটীতে চলিয়া গেল। চামেলী দ্বার রুদ্ধ করিয়া পালঙ্কোপরি শয়ন করিয়া ক্রন্দন-বিজড়িত-কণ্ঠে গাহিল—

এ ভব-সংসারে একা ফেলে মোরে,
কোথা চলে গেলে গো!
বৃথা এ জীবন বৃথা এ যৌবন
তুমি না আসিলে গো!!

এ জীবন মন করিনু সমর্পণ
তোমারি ও দু'টি চরণে,
তোমার বিহনে বাঁচিব কেমনে
বিস্মৃতি এনো না স্মরণে।

কোথা প্রাণ-সখা, দেও মোরে দেখা,
তুমি বিনা আমি কার!
যদি পায়ে ঠেল কোন্ প্রাণে বল,
বাঁধিব হৃদয়-তার।

(যদি) নাহি এস লাজে নানা লোক-মাঝে
এস গো নাথ গোপনে।
এস গো নিশীথে নিদ্রার মাঝেতে,
দেখা দিও সখা স্বপনে।

কেহ না দেখিবে কেহ না জানিবে
(নীরব) নিশীথে দেখা দিলে গো।
কত কথা কব কত গান গাব,
তোমারি দেখা পেলে গো।

চামেলী নয়ন-জলে গানটি গাহিয়া একটু তৃপ্তি পাইয়া অশ্রু মুছিল। রাত্রে সে স্বপ্নে দেখিল, যতীন্দ্রনাথ তাহার নিকট আসিয়াছে—তাহাকে বক্ষে ধরিয়া কত প্রেমের কথা কহিতেছে—কত হাসি হাসিতেছে—সেও হাসিতেছে। রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল। যতীন্দ্রনাথ তাহাকে বলিল,—"এখন আমি যাই মেলি! রাত্রি প্রায় শেষ হ'য়ে এলো! আমি কালও আস্‌ব; আমি ত রোজই তোমার কাছে আসি।" এই বলিয়া যতীন্দ্রনাথ যখন তাহার অধর চুম্বন করিল, তখন সে কাঁপিয়া উঠিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, সে কক্ষে কেহ নাই। সে একাকিনী নিদ্রা যাইতেছিল। তখন অর্দ্ধোন্মুক্ত জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের প্রভাতের অস্পষ্ট আলো প্রবেশ করিতেছিল, পাখীরা প্রভাতী গান ধরিয়াছিল, মধু মাসের মধুর বাতাস ধীরে ধীরে বহিতেছিল, পূর্ব্বাকাশ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল, সূর্য্যদেব তখনও উদিত হইয়াছিলেন না।

১৮

যথাসময়ে নন্দকুমার কলিকাতা হইতে শ্বশুরালয়াভিমুখে রওনা হইল। সারাটি পথ সে নীরব বিষণ্ণবদনে ভাবিল, কি করিয়া সে বাটীর মধ্যে প্রবেশ

করিবে, কেমন করিয়া সে তাহার শ্বশ্রূমাতার নিকট উপস্থিত হইবে, কোন্ মুখে সে চামেলীর সম্মুখে যাইবে ?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন সে তাহার শ্বশুরালয়ের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি অনেক। গ্রাম নীরব নিস্তব্ধ। কোথাও একটু সাড়া নেই, শব্দ নেই। দিবার বিকট কোলাহল, বিরাট নিস্তব্ধতায় পরিণত হইয়াছে। মাঝে মাঝে দুই একটী পাখী দুই একবার আচম্বিতে কূজন করিয়া সে বিরাট নিস্তব্ধতার শান্তিভঙ্গ করিতেছে।

আকাশ নক্ষত্রখচিত। সুধাংশুদেব তখনও উদিত হয়েন নাই। পৃথিবী অন্ধকারাবৃত। একে নিস্তব্ধতা, তাহার উপর আবার অন্ধকার। এই দুইটির সংমিশ্রণে সেই জঙ্গলপরিপূর্ণ গ্রামখানি কেমনই যেন একটা ভীষণাকৃতি ধারণ করিয়াছে।

নন্দকুমার সেই নীরব নিস্তব্ধ অন্ধকার রজনীতে একাকী গ্রামের সঙ্কীর্ণ পথটি বাহিয়া শ্বশুর বাটীর দিকে ধীর-পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল। সর্ব্বদাই মনে মনে চিন্তা করিতেছিল—কেমন করিয়া সে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে বাটীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—যখন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে তাহার প্রাণ সরিতেছে না, চরণ চলিতেছে না, তখন সে যাইবে না ; কেহ দেখিবার পূর্ব্বে সে ফিরিয়া যাইবে।

বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে এমনিভাবে ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার সর্ব্বশরীর গরম করাইতেছিল। মলয়ের ঝির ঝির সুগন্ধবাহী বাতাস তাহাকে শীতল করিতেছিল। এমন সময়ে সুমিষ্ট সুমধুর একটা করুণ স্বর তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। সে উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিল, বুঝিল, নারী-কণ্ঠের গান কোথা হইতে যেন আসিয়া আসিতেছে। আরও মনোযোগসহকারে শুনিয়া, এ কণ্ঠ তাহার নিকট বিশেষ পরিচিত

বলিয়া বোধ হইল। একটু ভাবিয়াই সে এ কণ্ঠ চিনিল। সে বুঝিল, চামেলী গাহিতেছে। কাণ পাতিয়া গানটি শুনিল। চামেলী গাহিতেছিল—

শূন্য রেখেছি হৃদয়-আসন
মুক্ত রেখেছি হৃদয়দ্বার।
রয়েছে পড়িয়া হৃদয়-বীণা
বেসুরো করা বীণার তার॥
এস হে নাথ পুষ্পিত-ভূবণে,
এস হে নাথ বস হে আসনে,
বাঁধগো বীণা সু-সুরো ক'রে,
ধরগো তান পঞ্চম-স্বরে,
পঞ্চম হ'তে উঠাও সপ্তমে সে তান,
ঘুমিয়ে পড়ি শুনিতে শুনিতে সে গান।
ঘুমিয়ে পড়ি বক্ষে তোমার
রুদ্ধ করি সে মুক্তদ্বার॥

গানটি শুনিয়া নন্দকুমার হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিল। চামেলীর গান গাহিবার এই স্বর—বড় করুণ, কাকুতিপূর্ণ, মিনতিভরা। কিন্তু এত কাকুতি, এত মিনতি—এ সকলই যে একটা বিরাট ব্যর্থতায় পরিণত হইবে! হৃদয়-আসন পরিত্যাগ করিয়া যে গিয়াছে, সে ত আর আসিবে না, কিন্তু তাহার আসার আশায় তাহার হৃদয়-দুয়ার মুক্ত রহিয়াছে! তাহার অভাবে যে তাহার জীবনটা একেবারেই নিষ্ফল হইতে বসিয়াছে! সে ত আর আসিয়া তাহার জীবনটাকে আবার উর্ব্বর করিবে না! আর ত সে আসিয়া কত প্রেমের কথা কহিয়া তাহাকে তাহার বক্ষে জড়াইয়া ধরিবে না! আর ত সে স্বামী-সোহাগে আদরিত হইয়া স্বামীর বক্ষের উপর, স্বামীর স্নেহমাখা কথা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িবে না! ওঃ! কি দারুণ বেদনা! এ যে অসহ্য—একেবারেই অসহ্য! এই অসহ্য

বেদনা হইতে অল্পবয়স্কা বিধবাদের পরিত্রাণ করিবার কি কোন উপায় নাই? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার কেহ নাই—কেহ নাই!

রাস্তায় দাঁড়াইয়া নন্দকুমার চামেলীর কথা এমনি ভাবে ভাবিয়া হৃদয়ে দারুণ বেদনা অনুভব করিতেছিল, এমন সময়ে বাড়ীর দারোয়ান্ পাঁড়েজী বাহিরে আসিয়া নন্দকুমারকে দেখিয়া অন্ধকারে না চিনিতে পারিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর হইতে স্বর একটু চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হুঁয়া পর কোন্ খাড়া হ্যায় রে?"

নন্দকুমার গভীর মনোযোগের মধ্যে চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না।

পাঁড়েজী পুনরায় বলিল, "কোন্ হ্যায়? বাত, কাহে নেহি বল্‌তে হো? এ মিশির ভাই! উঠত; হামারা লাঠিঠো লে আওতো।"

তখন নন্দকুমার দারোয়ান্‌কে চিনিতে পারিয়া বলিল, "কে? পাঁড়েজী?"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে পাঁড়েজী নন্দকুমারকে চিনিতে পারিয়া বলিল, "হাঁ হুজুর! আপ্ এত্তা রাত্‌মে?—কাঁহাসে আতা হ্যায়? কল্‌কাত্তাসে?"

"হ্যাঁ।"

"হিঁঞা পর খাড়া রহা হ্যায় কাহে? আইয়ে, হাম্ মাইজীকো বোলায় দেতা হ্যায়।"

"নেই, নেই, আভি মৎ বোলাও। সবের হোনে দেও।"

"বহুৎ আচ্ছা। সবেরকো থোড়া দের হ্যায়। আইয়ে, বৈঠকখানামে আভি বৈঠিয়ে।"

১৯

নন্দকুমার বৈঠকখানা-গৃহে আসিয়া একখানা কৌচের উপর নিজের শ্রান্ত দেহখানাকে অর্দ্ধশয়নে শায়িত করাইল। রাত্রি শেষ হইবার অধিক বিলম্ব ছিল না। তবু তাহার ঘুম আসিল না; অবসন্ন-দেহে, বিষাদপূর্ণ-হৃদয়ে ভাবিতে লাগিল—প্রভাত হইলে কিরূপে সে বাটীর মধ্যে যাইয়া সকলের সহিত দেখা করিবে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পূর্ব্বদিক্ পরিষ্কার হইয়া গেল। সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় সে রাত্রি অতিবাহিত করিল।

পাঁড়েজী শয্যাত্যাগ করিয়া, অন্দরমহলে যাইয়া শ্যামাসুন্দরীর নিকট বলিল, "মাইজী! কল্‌কাত্তাসে জামাই বাবু কাল রাত্‌মে আয়া।" ইহা শুনিয়া শ্যামাসুন্দরী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পাঁড়েজী ক্রন্দনের হেতু বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিল।

শেফালী মাতার ক্রন্দন শুনিয়া দৌড়াইয়া মাতার নিকট আসিয়া দেখিল—তাহার মাতা মাথা খুঁটিয়া কাঁদিতেছেন, পাঁড়েজী তাঁহার সম্মুখে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া সে কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পাঁড়েজীকে জিজ্ঞাসা করিল, "পাঁড়েদা! মা কাঁদ্‌ছেন কেন?"

পাঁড়েজী উত্তর দিল, "কল্‌কাত্তাসে জামাই বাবু আসিয়েছেন,—সেই জোন্থে।"

"কোথায় সে?"

"বৈঠকথানামে শুইয়ে আছেন।"

"বাড়ীর মধ্যে ডেকে দেওনা পাঁড়েদা, না, থাক্, আমিই যাচ্ছি, সে

ঘরে ত অন্য লোক নেই?" বলিয়া শেফালী বৈঠকখানা-ঘরে গিয়া দেখিল—নন্দকুমার অর্দ্ধশায়িত-অবস্থায় চক্ষু মেলিয়া স্থির-দৃষ্টিতে শুইয়া আছে। অল্পক্ষণ সেখানে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেফালী নন্দকে বলিল, "ভেতরে এস নন্দ!"

নন্দকুমার গভীর মনঃসংযোগে কি যেন ভাবিতেছিল। শেফালী কখন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। হঠাৎ মনুষ্য-কণ্ঠস্বরে সে একটু কাঁপিয়া উঠিয়া, চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—দ্বারপ্রান্তে শেফালী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া সে তাহার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। শেফালী পুনরায় বলিল, "বাড়ীর ভেতর এস নন্দ! মা কাঁদ্‌ছেন।"

নন্দ তেমনি ভাবে বসিয়া রহিল, উঠিল না। শেফালী পুনরায় কহিল, "কৈ? এস?"

"হ্যাঁ, চলুন" বলিয়া নন্দকুমার আসন ত্যাগ করিয়া, অনিচ্ছা-সত্ত্বে শেফালীর পিছন পিছন গিয়া, শ্যামাসুন্দরীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কয়েক-ফোঁটা চোখের জল মুছিল। শ্বশ্রুমাতাকে সান্ত্বনা দিবার অথবা কাঁদিতে নিষেধ করিবার শক্তি তখন তাহার ছিল না। নীরব নিশ্চল হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। শেফালী সেখানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ কাঁদিয়া, চোখের জল মুছিয়া মাতাকে বলিল, "মা! আর কেঁদো না, কেঁদে আর কি করবে? নন্দর খাওয়ার বন্দোবস্ত কর। রাত্রে হয়ত ওর কিছুই খাওয়া হয়নি। দেখনা—ওর মুখ শুকিয়ে গিয়েছে!"

শেফালীর কথায় তিনি কর্ণপাত না করিয়া অবিশ্রান্তভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। শেফালী তখন তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া বলিল, "মা! তুমি খেপ্‌লে নাকি? যাও, নন্দের খাওয়ার যোগাড় করগে।"

শ্যামাসুন্দরী তখন ক্রন্দনের চীৎকার থামাইয়া সে স্থান পরিত্যাগ

করিলেন। শেফালী তখন নন্দকে বলিল, "চল ভাই! কাপড় জামা ছাড়্‌বে চল।"

২০

শেফালী চামেলীর কক্ষে আসিয়া তাহাকে বলিল, "নন্দ এসেছে, বাহিরে আয়।" চামেলী বাহির হইল না। রুগ্নের মত যেমন ভাবে শয্যায় পড়িয়াছিল, ঠিক্ তেমনি ভাবে শুইয়া রহিল।

জামা কাপড় ছাড়িয়া জলযোগ সারিয়া নন্দকুমার চামেলীর সহিত দেখা করিতে তাহার কক্ষে গেল। নন্দকে দেখিয়া চামেলী বিছানায় মুখ ঢাকিল। নন্দ তাহার শয্যার এক পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিয়া তাহার সহিত কথা বলিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কিয়ৎক্ষণ এমনই ভাবে মূকের মত বসিয়া থাকিয়া সে তাহার কক্ষ ত্যাগ করিল। চামেলী তখন মুখ তুলিয়া একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না। অতি দুর্ব্বল-শরীরে কুইনাইন সেবন করিলে, মস্তিষ্ক যেরূপ ঝিম্ ঝিম্ করে, নন্দ তাহার কক্ষ ত্যাগ করিলে, তাহার মস্তিষ্কও ঠিক সেইরূপ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। পুনরায় শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

বৈকালে নন্দকুমার পুনরায় তাহার কক্ষে আসিল। চামেলী তাহাকে দেখিয়া পূর্ব্ববৎ উপাধানে মুখ লুকাইল। নন্দ তাহার শয্যার পার্শ্বে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ছলছল-নয়নে, বিষাদভরা-কণ্ঠে ডাকিল, "দিদি!"

চামেলী সে ডাকের কোন উত্তর দিল না। নন্দ আবার ডাকিল, "দিদি!"

শোক-লজ্জায় চামেলী নন্দকুমারের ডাকের উত্তরও দিতে পারিল না এবং উঠিয়া বসিতেও পারিল না। নন্দকুমার তাহাকে দুইবার ডাকিয়া

আর ডাকিল না—ডাকিতে পারিল না। অতি কষ্টে সে দুইটি মাত্র ডাক দিয়াছিল। তাহার পর তাহার কণ্ঠ কেমনই একটা গাঢ় বেদনায় রুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার চক্ষে জল আসিল। সে আর সেখানে বসিয়া না থাকিয়া, রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেল। চামেলী তখন দ্বারে অর্গল বন্ধ করিয়া প্রাণ খুলিয়া কতকটা আশা মিটাইয়া নীরবে কাঁদিয়া লইল।

পুত্র-শোক মাতাপিতার হৃদয়ে যতটা বেদনা দেয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বেদনা দেয়, স্ত্রীর হৃদয়ে স্বামী-শোক। এমন একদিন আসে, যেদিন পুত্র-শোকের জ্বলন্ত অনল একেবারে শীতল হইয়া যায়; মাতাপিতার মুখে আবার হাসি বাহির হয়, আবার তাঁহারা আনন্দ উৎসবে যোগদান করেন। কিন্তু হিন্দু-নারীদের স্বামী-শোকের জ্বলন্ত-বহ্নি কখনও একেবারে ভস্মে পরিণত হয় না—তবে সে বহ্নির প্রখরতা কিয়ৎপরিমাণে কমিয়া যায়। সে বহ্নি তখন ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া থাকে। বাতাস লাগিলে আবার তাহা দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠে।

চামেলী কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল, কিন্তু নন্দকুমারের আগমনে তাহার প্রাণ পূর্ব্বের মত আবার জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছিল।

পরদিন প্রভাতে নন্দকুমার পুনরায় চামেলীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চামেলী শয্যার উপর শুইয়া পড়িয়া, জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া শূন্য-দৃষ্টিতে কি যেন দেখিতেছে। কিয়ৎক্ষণ নন্দ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া দেখিল, তাহার মুখখানি বড় মলিন, শুষ্ক, সৌন্দর্য্যবিহীন। তাহা দেখিয়া সে হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিল। আপনা হইতেই তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। টপ্ টপ্ করিয়া তপ্ত-অশ্রু তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া মেঝেতে পড়িল। সে কাঁদিল—বেশ একটু কাঁদিল। নীরব ক্রন্দন ব্যতীত হিন্দু-বিধবাদের আশ্বাস' দিবার

কিছুই নাই! থাকিলেও তাহা ত' তাহাদের দেওয়া হইবে না! কারণ, কয়েক-ফোঁটা অশ্রুপাত করা যত সহজসাধ্য, তাহা ত' তত সহজসাধ্য নয়!

বিধবাদের বুকফাটা দুঃখে "আহা! ওঃ!" করিয়া সহানুভূতি প্রায় সকলেই দেখায়, কিন্তু তাহাদের সে দুঃখের প্রতীকার করিবার লোক কি আর্য্য-হিন্দুদের মধ্যে কেহ নাই? কে ইহার উত্তর দিবে! শত শত বৃদ্ধদের মধ্যে, সহস্র সহস্র প্রৌঢ়দের মধ্যে, লক্ষ লক্ষ যুবকবৃন্দের মধ্যে কেহই কি নাই—যে তাহার বক্ষখানা স্ফীত ক'রে, মস্তকটা উন্নত ক'রে বলে—আমি আছি—এ দুঃখের প্রতীকারের জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করছি? কি! নীরব—নিথর—নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ! কেহ নাই? কেহ নাই? এ দুঃখিনীদের আপনার বলিয়া জড়াইয়া ধরিবার কেহ নাই? কেহ নাই! কেহ নাই! প্রতীকার করিবার অবসর কাহারও নাই! তবে কাঁদ—কাঁদ—কাঁদ অভাগিনী পতিহারা নারীবৃন্দ! সকলে মিলিয়া সুর করিয়া কাঁদ! তোমাদের আত্মীয়-স্বজন কাণ পাতিয়া শুনিয়া কর্ম্মক্লান্ত দেহ-খানিতে শান্তির উৎস ছুটাইয়া দিয়া অঘোর নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়ুক। বীণা! আর এমন সুর তুমি বাজাইও না। পার ত' অন্য সুর বাজাও! বাজাও—কে আছ হিন্দু-সন্তান! একবার চাহিয়া দেখ—যুবতী বিধবারা ফুটন্ত-নলিনীর মত রূপের জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে! রূপ উপভোগ না করিয়া নয়ন দিয়া বৃথা চাহিয়া দেখিলে লাভ কি?

* * *

চামেলীর বিষাদাক্লিষ্ট মলিন-মুখের পানে চাহিয়া, নন্দকুমার কিয়ৎক্ষণ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ডাকিল—"দিদি!"

নিস্তব্ধ-কক্ষে হঠাৎ মনুষ্য-স্বরে চামেলী চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া নন্দকে দেখিয়াই উপাধানের মধ্যে মুখ লুকাইল।

নন্দকুমার ধীরে ধীরে তাহার শয্যার একপার্শ্বে বসিয়া আবার ডাকিল—

"দিদি!" তথাপি চামেলী নীরব। নন্দকুমার আবার চামেলীকে ডাকিয়া বলিল—"যা হবার তা ত' হ'য়ে গেছে; এখন আর অমন ক'রে শুয়ে থাক্‌লে ত' চল্‌বে না দিদি! তোমাকে আবার উঠ্‌তে হবে, হৃদয়ের জ্বালা হৃদয়ে চেপে আবার তোমাকে বাইরে হাস্‌তে হবে—কথা কইতে হবে! ওঠ দিদি! মিছি মিছি ভেবে আর মন খারাপ ক'রো না। তিনি চ'লে গেছেন, সংসারের অশান্তির হাত হ'তে উদ্ধার পেয়ে, স্বর্গে গিয়ে বড় শান্তিতে আছেন। তাঁকে ভেবে ভেবে, তাঁকে চঞ্চল করা ত' স্ত্রী হ'য়ে তোমার কর্ত্তব্য নয় দিদি!"

নন্দকুমার চুপ করিল। চামেলী তেমনি নীরবে, তেমনি ভাবে শুইয়া রহিল। তখন নন্দকুমার তাহার মস্তকে কয়েকবার মৃদু ধাক্কা দিতে দিতে কহিল, "ওঠ দিদি! আমার মুখখানা একবার চেয়ে দেখ ত? দেখ তোমার দুঃখে আমার মুখখানা কত ম্লান হ'য়ে পড়েছে! প্রাণে একবিন্দু শান্তি নেই—রাবণের চিতার মত মনটা দিবানিশ ধু ধু ক'রে জ্বল্‌ছে! তুমি যদি এমনি ক'রে থাক্‌বে, তবে আমার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌বে কে? তুমি দিদি,—তুমি যদি ভায়ের দিকে না তাকাবে, তা'কে দু'টো কথা ব'লে সান্ত্বনা না দেবে, তার প্রাণের হাহাকার না নিভাবে, তবে কি তোমার কর্ত্তব্য করা হবে দিদি! আর এম্‌নি ক'রে থেকো না—আমার দিকে একবার তাকাও!"

চামেলী তথাপি মুখ ফিরাইল না—ফিরাইতে পারিল না। কেমনই একটা সঙ্কোচ আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল। তখন নন্দকুমার তাহাকে ধরিয়া উঠাইয়া বসাইয়া দেখিল, তাহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরত অশ্রু ঝরিতেছে। তাহা দেখিয়া তাহারও কয়েক-ফোঁটা অশ্রু ঝরিল। নিজ অশ্রু মুছিয়া অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল—"দিদি! অমন ক'রে নিজে কেঁদে সবাইকে আর কাঁদিও না! চ'খের জল মুছে ফেল!"

চামেলী অনেক কষ্টে গম্ভীর স্বরে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"চোখের জল যতই মুছ্‌ছি—ততই যে প'ড়ছে! আমি কি নিজে ইচ্ছে ক'রে জল ফেল্‌ছি ভাই? এ যে প্রাণের কোন্ এক অজানা দেশ থেকে, আমাকে না জানিয়ে, আমাকে এমনি ক'রে কাঁদাচ্ছে! যতই ভাবি কাঁদ্‌ব না, ততই কান্নাটা আরও জোরে আসে! প্রাণের মধ্যে একটা নীরব হাহা-কারের প্রখর উত্তাপ অহর্নিশ আমাকে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে মার্‌ছে;—এরা আমাকে যে কি ভাবে অস্থির কর্‌ছে, তা' আমি মুখে প্রকাশ কর্‌বার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে! দিন-রাত আমার যে কি ভীষণ জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হ'চ্ছে, তা'তে আমার আর এক তিলও বাঁচ্‌বার সাধ থাকে না! সব সময়ই মনে হয়, এইখানে এই মুহূর্ত্তেই আমার জীবনের যবনিকা প'ড়ে যাক্! মাঝে মাঝে আত্মহত্যা কর্‌তেও ইচ্ছা হয়!"

"ছিঃ! অমন কথা মনেও স্থান দিও না দিদি! ও-কথা মুখে আনাও পাপ!"

উত্তেজিত-কণ্ঠে চামেলী কহিল, "পাপ বল্‌ছ তুমি? আত্মহত্যায় বিধবাদের যে কি শান্তি তা' যারা বিধবা, তারাই বুঝ্‌বে! আত্মহত্যায় দ গভর্ণমেণ্ট কোন কথা না বল্‌ত, তবে দেখ্‌তে—বাঙ্গালার প্রত্যেক কিশোরী প্রত্যেক যুবতী-বিধবা আত্মহত্যা ক'রে প্রাণের অসহ্য জ্বালা জুড়াত। পাপ বল্‌ছ তুমি!—যখন সবাই সাম্‌নের উপর দাঁড়িয়ে, মুখ উঁচু ক'রে, জোর-গলায় বিধবাদের "অলপ্যেয়ে, অলক্ষণে, স্বামীখাগী" এই রকম কথা ব'লে গালি দিতে থাকে, তখন এমন কোন্ বিধবা আছে, যে ভাব্‌তে পারে—আত্মহত্যায় মহাপাপ?"

নন্দকুমার নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া চামেলীর কথা শুনিতেছিল। চামেলী ক্ষণকালের জন্য নীরব হইয়া আঁখিজলে ভাসিতে ভাসিতে আবার বলিতে লাগিল, "ভাই! স্বামীই যে নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ! এ সম্পদ কি কেউ

পায়ে ঠেলে? এ সম্পদ কি কারো অবহেলার দ্রব্য? এ সম্পদ কি কেউ সাধ ক'রে হারাতে চায়—না হারায়? স্বামী যে নারীর কি জিনিস, তা' তুমি হয় ত বুঝবে না, কিন্তু জেনে রাখ, নারীর যা' কিছু অহঙ্কার, নারীর যা' কিছু অলঙ্কার, নারীর যা' কিছু ঐশ্বর্য্য, সমস্তই ঐ স্বামী। এমন স্বামীকে কি কেউ ইচ্ছা ক'রে বিনাশ করে? মাতাপিতা সন্তানের কাছে দেবতার মত পূজা, কিন্তু বিবাহ হ'লে কন্যা-সন্তানের কাছে তাদের স্বামী তাঁদের চেয়েও অনেক বেশী পূজনীয়। নারী স্বামীর জন্য কি না ক'রতে পারে? প্রয়োজন হ'লে স্বামীর জন্য তারা স্নেহের ভাই বোন্‌কে, পূজনীয় মা বাপকে জন্মের মত ত্যাগ করতে পারে। যারা স্বামীকে এত ভালবাসে, এত আপনার ভাবে, তারা কি কখনও সেই স্বামীর উচ্ছেদসাধন করতে পারে?"

চামেলী একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, "সে চ'লে গেছে, জন্মের মত আমায় ছেড়ে চ'লে গেছে, তা'তে আমার যতটা কষ্ট হয়েছে, তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী কষ্ট হয়েছে, আমার শ্বশুর-বাড়ীর কথায়—যাঁরা বলেন, ঐ রাক্ষসী ডানটাই আমাদের সোণারচাঁদ ছেলেকে খেয়েছে। নন্দ! ভাই! এ কথা কাণে শুন্‌বার জন্য আমাকে বেঁচে থাকতে বল?"

চামেলী আর কোন কথা কহিতে পারিল না। কেমনই একটা বেদনা, তাহার কণ্ঠ-নালী চাপিয়া ধরিল। তাহার চক্ষু দিয়া অনবরত তপ্ত-লবণাক্ত-বারি ঝরিতে লাগিল। নন্দকুমার প্রস্তর-মূর্ত্তির মত বসিয়া উদাস-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

২১

রজনী দ্বিপ্রহর। ঋতুরাজের আগমনে, শরীর-জুড়ান মলয় শীতল বাতাস সুগন্ধ পুষ্পের গন্ধ আহরণ করিয়া দাতাকর্ণের মত ইতস্ততঃ বিতরণ

করিয়া দিতেছে। নির্মেঘ নির্ম্মলাকাশে চন্দ্রমা হাসির মাধুরী ছড়াইয়া দিয়া, চকোর চকোরীকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া, পৃথিবীকে রজত-শুভ্র-আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া দিতেছে।

এমন সুন্দর নিশিতে কেহ মিলনানন্দে প্রেমের গান গাহিতেছে, কেহ বিরহ-কাতর-হৃদয়ে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, কেহ বা চিরবিরহের অন্ধকারে পড়িয়া নয়নজলে নৈশ-উপাধান সিক্ত করিতেছে।

সে যাত্রায় সেদিনকার সেই রাত্রেই প্রথম নন্দকুমার, তাহার স্ত্রী জুমেলীর সহিত এক শয্যায় শুইয়া, চামেলী-সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়া হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করিতেছিল।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই নন্দকুমার ভাবিয়াছিল, একদিন সে জগৎকে দেখাইবে—কেমন করিয়া স্ত্রীকে ভালবাসিতে হয়! প্রত্যেক পুরুষ-হৃদয়েই নারী-প্রেম আছে। কিন্তু তাহার হৃদয়ে এই প্রেমটি ছিল একটু বেশী। যদি কোন পুরুষ তাহার স্ত্রীর ভালবাসা উপেক্ষা করিয়া গণিকালয়ে গমন করিত অথবা স্ত্রীর অন্যায়-সত্ত্বেও স্ত্রীকে প্রহার করিত, তাহা হইলে সে হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিত; শুধু দুঃখ অনুভব করিয়াই সে ক্ষান্ত হইত না, তাহার মতিগতি ফিরাইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত। কিন্তু আজ চামেলীর চিন্তায় তাহার হৃদয়ের সে ভালবাসার উৎস শুকাইয়া গিয়াছে—এখন সে হৃদয় বিষাদের গাঢ় কৃষ্ণছায়ায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এখন সে ভাবিতেছে—এই ত' বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর সুখ, যাহা মুহূর্ত্তে সাগরের বুদ্‌বুদের মত বিলীন হইয়া যাইতে পারে! এই ত' মিলনের শান্তি, যাহা আচাম্বতে বিনষ্ট হইতে পারে! তবে কেন মানব নিশ্চয়তাহীন-দীর্ঘকালস্থায়ী-সুখশান্তির অন্বেষণে ভ্রান্তের মত ঘুরিয়া বেড়ায়? তবে কেন মানুষ অপরিণামদর্শী হইয়া, পতঙ্গের মত সুখশান্তির অনলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, অবশেষে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে!

অনেকক্ষণ ধরিয়া নন্দকুমার তন্ময় হইয়া নীরবে এমনি ভাবে ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার অজ্ঞাতসারে, একটী সুদীর্ঘ তপ্ত নিঃশ্বাস তাহার হৃদয়ের কোন্ এক নিভৃত দেশ হইতে বাহির হইয়া তাহার তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া দিল। তখন তাহার কর্ণের মধ্য দিয়া একটী করুণস্বর প্রবেশ করিয়া তাহার হৃদয়-তন্ত্রীকে আঘাত করিল। এ স্বর তাহার পরিচিত। সে বেশ বুঝিল—পার্শ্বের কক্ষ হইতে চামেলী গাহিতেছে। সে কাণ পাতিয়া গানটি শুনিল। চামেলী গাহিতেছিল—

এস এস এস, এসহে নাথ,
এসহে আমার পাশে।
আমি যে নাথ, ব'সে আছি,
তোমার আশ্বাসে॥
তুমি যদি না দেও দেখা,
কেমন ক'রে থাক্‌ব একা,
জীবনটী যে ব্যর্থ হবে তোমার নিরাশে।
আকুলপ্রাণে, নয়ন-জলে, ডাকিগো তোমায়;
দেবতার মত তুমি ওগো! হ'য়ো না নির্দ্দয়।
তেম্‌নি প্রেমের হাসি হেসে,
এস আমার পাশে॥
আমি যে নাথ ব'সে আছি, তোমার আশ্বাসে॥

গান শেষ হইল। নন্দকুমার মৃদুকণ্ঠে ডাকিল,—"জুমি!"

জুমেলী স্থির হইয়া শুইয়া থাকিয়া নীরবে ভাবিতেছিল—দিদির ব্যথার কি কোন প্রতিকার নাই! নন্দকুমারের ডাক শুনিয়া সে উত্তর দিল, "কেন?"

নন্দকুমার বলিল, "তুমি তোমার দিদির কাছে শোও গিয়ে। যে ক'দিন আমি এখানে থাক্‌ব, সে ক'দিন তুমি আমার কাছে শুয়ো না।

জুমেলী স্বামীর আদেশ পালন করিল।

চামেলীর কক্ষের ভেজানদ্বার ঠেলিয়া জুমেলী তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলে, সে জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে জুমি? এত রাত্রে—"

জুমেলী উত্তর দিল, "আমি তোমার কাছে শোব দিদি!"

"কেন রে? নন্দ তোকে ব'কেছে বুঝি?"

"না।"

"তবে?"

"অমনি।"

"না, নিশ্চয়ই সে তোকে ব'কেছে। স্বামী যদি তুই এক কথা ব'লেই থাকে, তবে কি বোন্! স্বামীর ওপর রাগ করতে হয়? পতি যে নারীর পরম গুরু! তার ওপর রাগ করতে নেই বোন্! পতি ছাড়া নারীর যে কিছুই নেই! আজ তুই ছোট, তাই তুই বুঝ্‌ছিস্ না—স্বামী নারীর কি অমূল্য ধন! মা জীবিত থাক্‌তে মায়ের স্নেহ যেমন উপলব্ধি করা যায় না, দাঁত থাক্‌তে যেমন দাঁতের মর্ম্ম বোঝা যায় না, তেম্‌নি অল্প-বয়সে স্বামী যে কি জিনিস, তা' বোঝা যায় না! বয়স হ'লে সবই বুঝ্‌তে পার্‌বি! পতিহারা নারীর যে কি অসহ্য যন্ত্রণা—আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করি বোন্! তুই যেন স্বামীর পায়ে মাথা রেখে, তোর শেষ নিশ্বাস ফেল্‌তে পারিস্! যা' বোন্! স্বামীর কাছে গিয়ে, তার পা ধ'রে ক্ষমা চা'গিয়ে! আর কোন দিন স্বামীর ওপর রাগ করিস্‌নে—অভিমান করিস্‌নে বোন্! স্বামীর সেবায় তোর জীবনটা উৎসর্গ ক'রে দিস্, দেখ্‌বি—স্বামীর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করা, কি শান্তির!"

চামেলীর কথা শেষ হইতে না হইতেই নন্দ সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া জুমেলী কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

নন্দকুমারকে সে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চামেলী কহিল, "কি

নন্দ! তোমাদের মধ্যে হ'য়েছে কি? ভাই! তুমি ছেলেমানুষ—কিছুই বোঝে না, ওর ওপর রাগ ক'র না ভাই!"

"রাগ ক'র্‌ব কেন দিদি! ওত' কিছুই করেনি! আমিই ওকে এখানে আস্‌তে ব'লেছি!"

"কেন?"

এই 'কেন'র কোন উত্তর নন্দকুমার দিল না! 'কেন'র উত্তর দিতে তাহার বড় বাধ-বাধ ঠেলিতে লাগিল।

চামেলী উত্তরের অপেক্ষায় ক্ষণকাল বসিয়া থাকিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "কি, চুপ ক'রে রইলে যে? উত্তর দাও।"

সরমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া নন্দকুমার বলিল, "দিদি! প্রলোভন জিনিসটা বড়ই ভীষণ। প্রলোভনের মাঝে পড়্‌লে কত প্রাজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা চঞ্চল হ'য়ে ওঠেন, আর তোমরা ত অজ্ঞ, অবোধ, কিশোরী।"

"আমার কথার উত্তর দাও—অন্য কথা পেড়ে আমাকে ভুলোচ্ছ বুঝি?'

"না দিদি! এই ত তোমার কথারই উত্তর দিচ্ছি।"

"এ কি উত্তর? এ উত্তর ত আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, সরলভাবে উত্তর দেও।"

"আর একটু ব'ল্লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে—খারাপ দৃশ্য দর্শন কর্‌লে, অথবা খারাপ বিষয় নিয়ে আলোচনা কর্‌লে, মনটা খারাপ হ'য়ে যায়। তাই বলছিলাম—আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মিলন দেখে, তোমার তাঁর মিলনের স্মৃতি মনে প'ড়ে যেতে পারে; সেই জন্যই—"

কামান-গর্জ্জনের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া চামেলী কহিল, "নন্দ! তুমি আমায় এতই হেয় মনে কর, যে ছোট বোন্, ছোট ভগ্নীপতি দেখে, আমার মন চঞ্চল হবে?"

অতি কোমলস্বরে নন্দকুমার কহিল, "অন্যায় ব'লেছি দিদি! অপরাধ

ক'রেছি—ক্ষমা কর! কিন্তু দিদি! যৌবনকে যে কখনও বিশ্বাস করতে নেই! তুমি এখনও বুঝতে পারছ না দিদি যে, বিধবাদের আপনার বলতে কেউ নেই! যখন তারা যৌবনের উত্তাল-তরঙ্গে প'ড়ে হাবুডুবু খেতে থাকে, তখন তাদের কেউ রক্ষা করতে ছুটে আসে না! তখন ত' কেউ তাদের বলে না—'ভয় কি? এই যে আমি আছি; আমি তোমাকে এই তরঙ্গ থেকে উদ্ধার ক'রে শান্তির পথ দেখাব; দেখবে—সে পথ কত সুখের—কত আনন্দের!' প্রলোভনের তাড়নায় প'ড়ে, যখন বিধবারা নিজেদের মঙ্গল ভুলে গিয়ে, নিজেদের সর্ব্বনাশ করতে উন্মাদের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন তারা তাদের আপনার লোকদের নিকট হ'তে এমন কিছু পায়, যা'তে তাদের প্রলোভনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। তখন তারা বংশের উন্নত-মস্তক চিরতরে নীচু করতে, একটুও কুণ্ঠিত হয় না। সুশিক্ষা দিয়ে, যুবতী বিধবাদের মনে পবিত্র ভাব জাগিয়ে দিতে কয়টি অভিভাবক জানে—কয়টি অভিভাবক এমন কাজ ক'রে থাকে?"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নন্দকুমার নীরব হইল। চামেলা নন্দকুমারের কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে ভাবিয়া কহিল, "নন্দ, ভাই! আমি বহু পুণ্যবলে তোমাকে পেয়েছি! এখন আমার মনের যেমন অবস্থা, তা'তে বোধ করছি--আমি কোন দিন ভুলপথে যা'ব না। কিন্তু যৌবনকে যখন বিশ্বাস করতে নেই, তখন যদি কোন দিন আমার মনে কোনরূপ চাঞ্চল্যের উদয় হয়, তখনই তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়িও—আমি সব ভুলে যাব'!"

এইটুকু বলিয়া চামেলী চুপ করিল। নন্দকুমারও আর কোন কথা বলিল না। উভয়েই নীরবে চিন্তিত-মনে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, চামেলী একটী দীর্ঘ তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভাই! তোমরা কি আমাকে স্বামীর কথা ভুলে যেতে বল? না,

অ' বোলো না ভাই! তাঁর স্মৃতি যতদিন আমার হৃদয়ে জাগরূক থাক্‌বে, ততদিন কেউ আমাকে ভুলপথে নিতে পার্‌বে না। তাঁর স্মৃতিটা যে বড় মধুর! তাঁকে ভাবতে আমার বেশ লাগে। কিন্তু একটু দুঃখ—জীবনে আর কোন দিনও তাঁকে পাওয়া যাবে না। ঐই দুঃখটার জন্যই যে আমার বুকখানা ফেটে চৌচির হ'য়ে যেতে চায়! একটা সন্তানও যদি তিনি রেখে যেতেন—জানি না—ভগবানের চরণে কত জন্মে কত অপরাধ করেছি, যার জন্য এ জীবন ভ'রে অপুত্রক থেকে, আমাকে নারী-জন্মের অপবাদ ভোগ কর্‌তে হবে! হিন্দু আমি! মৃত্যুর পর একটু জলপিণ্ডও পাব না! যাক্ সে কথা।"

এই বলিয়া সে আবার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, হৃদয়ের ঘন-বেদনাকে কিঞ্চিৎ হাল্‌কা করিয়া দিয়া, অন্যমনস্ক হইয়া শূন্য-দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া, আবার বলিতে লাগিল, "নন্দ! দেখ্‌ছ ভাই! কি সুন্দর আজকের রাত্রিটা! ঐ শান্ত নির্ম্মল গগনে, সুধাংশু কি সুন্দর মধুর হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে যাচ্ছে! শুভ্র জ্যোৎস্নার সংস্পর্শে, মুগ্ধ পাপিয়া, পিউ পিউ ক'রে বিরহের ডাক্ ডেকে উঠ্‌ছে! সুগন্ধবাহী মৃদুমন্দ মলয় পবন, প্রাণটাকে মাতোয়ারা ক'রে, শরীরটাকে জুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে! এমন রাত যে তিনি বড় ভালবাসতেন! আমিও এমন রাত বড় ভালবাসতাম; কিন্তু এখন শত চেষ্টা ক'রেও ভালবাসতে পারিনে—এখন এমন রাত দেখে, বুকের মাঝ থেকে, একটা হাহাকার চীৎকার ক'রে ওঠে!—আমার কাঁদ্‌তে বড় সাধ হয়! এমন কত রাত্র আমরা চকোর-চকোরীর মত মুখোমুখী হ'য়ে ব'সে বিনিদ্র-নয়নে কাটিয়েছি? আর আজ? এমন রাত্রে আমি কত গান গেয়েছি! তিনিও কত গান গেয়েছেন!—তাঁর গলায় সুর ছিল না, তবুও তিনি গাইতেন—নন্দ, ভাই! একটা গান গাওনা?"

নন্দকুমার জড়ের মত বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে কোন কথা,

সে বলিতে পারিল না। চামেলীর বিষাদ-ভরা কথায় সে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া সমস্ত ভাষা ভুলিয়া গিয়াছিল।

নন্দকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, চামেলী আবার বলিল, "কৈ, গাওনা ?'

নন্দ অনেক কষ্টে ভাষার পুনরুদ্ধার করিয়া গাহিল—

সখি ! সজল-নয়নে থেকো নাকো চাহি' ;
প্রাণে দিও না ব্যথা করুণ স্বরে গাহি'।
যে জন গিয়াছে চলি'—তোমারে ভুলি' ;
তার তরে কেন, ভাস সদা আঁখি-নীরে।
তুমি কেঁদো না, কেঁদো না,
কাঁদিলে হেথা পাবে না,
স্মৃতি তার বুকে ধ'রে জ্বালা সহ ধীরে !
মরণ পরে, মিলন হবে.—চিন্তা নাহি ॥

গান থামিল। গান থামিবামাত্রই চামেলী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যই কি মরণের পর মিলন হয় ?"

নন্দকুমার উত্তর দিল, "হাঁ, সত্যই হয় দিদি !"

চামেলী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমি যাও, রাত অনেক হ'য়েছে—শোও গিয়ে ভাই !"

নন্দকুমার আর কোন কথা না বলিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে গেল।

চামেলী তখন শয্যায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—তাহার স্বামীর কথা। এমন সুন্দর রাত্রিতে যদি তাহার স্বামী স্বর্গ হইতে হঠাৎ তাহার পার্শ্বে আসিয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লয়, তবে কেমন সুন্দর হয় !

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার নয়নদ্বয় তপ্ত-অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। হৃদয়ের মধ্যের রুদ্ধ ব্যথা অমাবস্যার জোয়ারের মত বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। সে নারী-সুলভ-সরমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া

বলিল,—"এস, এস প্রিয়তম! একবার তেম্‌নি ক'রে এসে, আমার পাশে ব'সে, আমাকে তোমার কোলের মধ্যে টেনে লও! একবার তেম্‌নি ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে আমার সঙ্গে কথা কও! এস, এস স্বামি! হৃদয়-স্বর্ব্বস্ব! এস আমার জন্মজন্মের বাঞ্ছিত ধন! তোমার স্পর্শনে আমার প্রাণের মাঝে একটা শিহরণ খেলে যাক্!"

২২

পার্শ্বের বাটীতে বিবাহ। প্রভাত হইতে সে-বাটীতে বিবাহের বাজনা বাজিতে লাগিল।

বড়-বাড়ীর প্রত্যেকেরই সে বিবাহে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ হইল।

শ্যামাসুন্দরীর ও চন্দ্রনাথ বাবুর হৃদয়ে আজ বড় ব্যথা বাজিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন,—বিবাহের আনন্দে যোগদান করিবেন কি না? যদি না করেন, তবে ভবিষ্যতে কোনদিন কোন কার্য্যে তাহারা তাঁহাদের বাটীতে আসিবে না। আর যদি বিবাহে যোগদান করেন, তবে কোন্ প্রাণে তাঁহারা চামেলীকে ছাড়িয়া উৎসবে মাতিবেন? চামেলীকে উৎসবে যোগ দিবার অনুমতি দিলে,—সে অবোধ মেয়ে—সে যদি কোন মাঙ্গলিক দ্রব্য স্পর্শ করে, তবে যে প্রত্যেকে তাহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিবে! অভিমানিনী কন্যা সে, সে কখনও এ তিরস্কার সহ্য করিতে পারিবে না; কাঁদিবে, অনেক কাঁদিবে, তাহার কোমল প্রাণে বড় ব্যথা লাগিবে!

বেলা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শ্যামাসুন্দরীর মস্তিষ্কও ক্রমশঃ উষ্ণ হইতে লাগিল। বিষণ্ণ-মনে কন্যার কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তিনি বিবাহ-বাটীতে দৌড়াইয়া গিয়া পাত্রীর মাতাকে বলিলেন, "ওরে!

লতির বিয়ে দিচ্ছিস্? তোদের জ্ঞান-চক্ষু কি খুল্‌বে না? তোরা কি চিরকাল এম্‌নি ভাবে ঘুমিয়ে থাক্‌বি?—মোটেই জাগ্‌বি না? পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছিস্? জানিস্ না—পুরুষেরা কি নিষ্ঠুর? আয় না, আমরা সবাই মিলে ওদের একঘ'রে করি! আয় ত', ওদের একবার মজাটা দেখিয়ে দিই!"

তাঁহার কথায় লতিকার মাতা অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। কথার কোন উত্তর না পাইয়া, তিনি বিরক্ত হইয়া "না, তোদের ঘুম আর ভাঙ্গবে না; ঘুমো, খুব ঘুমো" বলিয়া ঝড়ের মত সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, বাটীতে আসিয়া দেখিলেন,—তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা হাসিয়া হাসিয়া, প্রাঙ্গণে একটী বিড়ালের সহিত খেলা করিতেছে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া কহিলেন, "ওরে খুকি! বিয়ে ক'র্‌বি? বিয়ে না ক'রে পার্‌বি না, না?"

বহুক্ষণ পরে মাতাকে পাইয়া, খুকী তাঁহার স্তনপান করিতে আরম্ভ করিল। তিনি কহিলেন, "ওরে বেটি! দুধ্ খাস্ পরে, এখন বল্ ত' কাকে বিয়ে ক'র্‌বি?"

খুকী আপন মনে স্তনপান করিতে লাগিল। অবোধ শিশু মাতার উন্মত্ততার কিছুই বুঝিল না। শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন, "তুই বল্‌তে পার্‌ছিস্ না, আচ্ছা, আমিই তোর বর ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া "পেয়েছি, পেয়েছি," বলিয়া চীৎকার করিয়া কীর্ত্তনে গাহিলেন—

"কিবা সুন্দর, মোহন মুরতিধর,
কাল ছোঁড়াটি!
ত্রিভঙ্গ বাঁকা, তুলিতে নয়ন আঁকা
ধীরে ধীরে কহে কথাটি!!
ও সে প্রেমছাড়া কিছু জানে না হে!!!"

কীর্ত্তনের এই পদ কয়টি গাহিয়া তিনি 'হো হো' করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া বলিলেন, "কেমন বর? এখন পছন্দ হ'য়েছে?"

জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে উঠিলে, কাহার না আনন্দ হয়? বৃদ্ধ হইতে অবোধ শিশু পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই, মাতার ক্রোড়ে উঠিলে, কেমনই একটা অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদ হয়। খুকী মাতৃ-অঙ্কে উঠিয়া, মহাহ্লাদে মাথা ঝাকাইতে ঝাকাইতে মাতৃ-বক্ষের সুমিষ্ট-সুধাপান করিতে লাগিল।

খুকীকে মাথা ঝাকাইতে দেখিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, "কি, মাথা নাড়ছিস্ যে? ভাল না? ও বর ভাল না? হ্যাঁ, তাই ত', ও বর ত' ভাল না! ও যে মানুষের চেয়েও নিষ্ঠুর! ও যে মানুষের চেয়েও সহস্রগুণ অত্যাচারী! তুই তা'হলে বুঝেছিস্—আমার মনে ছিল না,—মনে এখন আমার কিছুই থাকে না—পাগল হ'য়ে গেছি কি না? যাক্, তা'হলে তোর আর বিয়ে ক'রে কাজ নেই।—কি? আবার মাথা নাড়ছিস্ যে? বিয়ে করতেই হবে? ঘুম থেকে জাগ্‌বি না? বেশ, তবে বর কোথায় পাই? হাঁ, পেয়েছি, পেয়েছি; দু'টি বর পেয়েছি। পশু আর পক্ষী। নে' বেছে নে', পসন্দ ক'রে নে', কোন্‌টি? পাখী? না। অত স্বাধীনতা বুঝি হঠাৎ সহ্য কর্‌তে পার্‌বি না। তবে, পশু? বেশ, তাই হবে।"

এই বলিয়া তিনি খুকীকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিয়া, দক্ষিণ-পাড়ায় ছুটিলেন—কন্যার বিবাহ-বাসরে গায়িকা স্থির করিবার জন্য।

বিবাহোপযোগী তিন তিনটী পুত্রের মৃত্যুতে শ্যামাসুন্দরীকে তত কাতর করিতে পারে নাই, কিন্তু জামাতার মৃত্যুতে তাঁহাকে উন্মাদ করিয়া দিয়াছে।

"লর্ড বেণ্টিং! কোথায় তুমি! যেখানেই থাক, একবার চেয়ে দেখ, একবার, মাত্র একবার চেয়ে দেখ—এই হিন্দু-বিধবা ললনার দিকে! পাষাণের চেয়েও কঠোর যদি তোমার হৃদয় হয়, তবু তা' দ্রব হ'য়ে যা'বে! কিন্তু তুমি ত পাষাণ নও! তোমার হৃদয় যে কুসুমের চেয়েও কোমল!

তোমার প্রাণ একদিন এই পতিহারাদের জন্য কেঁদে উঠেছিল,—তাই তুমি জ্বলন্ত অনল থেকে তা'দের রক্ষা ক'রেছিলে,—আজও কর্‌ছ! কিন্তু তুমি বুঝ্‌তে পারনি,—ঐ লেলিহান অনল-শিখাই তাদের স্নেহময়ী রক্ষার্থীর সুকোমল ক্রোড়, আর জীবনধারণ তাদের শত-সহস্র বৃশ্চিক-দংশন! বেণ্টিং! বেণ্টিং! আর একবার তেম্‌নি স্নেহের চক্ষে এই পতিহারা হিন্দু-ললনার দিকে চেয়ে দেখত',—তুমি বাইরের আগুন নিভিয়েছ, আর ঐ দেখ—ভিতরে আগুন জ্বল্‌ছে! কিসের আগুন জান?—তুষের আগুন,—উপরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না—ভস্মাচ্ছাদিত,—ঐ বহ্নি অহরহঃ তাদের দগ্ধ ক'র্‌ছে! তারা সমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারের ভয়ে নীরবে ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছে! একটিও কথা বল্‌ছে না,—হৃদয়কে জোর ক'রে চেপে ধরেছে! চেয়ে দেখ, ঐ বহ্নি তাদের কি কঠোর যন্ত্রণা দিয়ে, তিলে তিলে হত্যা ক'র্‌ছে! এস ত' ভাই! এ কঠোর, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর হত্যা তুমি ছাড় কেউ নিবারণ ক'র্‌তে পার্‌বে না! এস ত' ভাই! আর একবার এস! একদিন গগনস্পর্শী অনলশিখা দেখে, যেমন ক'রে, দয়ার্দ্রচিত্তে স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমির কোমল অঙ্ক থেকে লাফিয়ে প'ড়ে, জীবন তুচ্ছ ক'রে, চিরবিক্ষুব্ধ সাগরের ভৈরব গর্জ্জনের মধ্যে নিজেকে ফেলে, এই সুদূর পারাবার লঙ্ঘিয়ে, অযাচিত করুণাসিন্ধু নিয়ে ছুটে এসে, নিঃশেষ ক'রে সমস্তটা দিয়ে গিয়েছিলে, আজ একবার তেম্‌নি ক'রে, দয়ার্দ্রচিত্তে ধরিত্রীর বক্ষমধ্যে লুক্কায়িত অনন্তশয়ান হ'তে একবার মাত্র মুহূর্ত্তের জন্য যাচিত করুণা নিয়ে ছুটে এস ত' ভাই!—কি! নীরব—নির্ব্বাক্‌—নিস্তব্ধ! আস্‌বে না? আস্‌বে না? কেন? এই তোমার সম্মুখে জানু পেতে করুণা ভিক্ষা চাচ্ছি,—করযোড়ে কাকুতি-মিনতি ক'রে কম্পিতস্বরে প্রার্থনা কর্‌ছি,—চরণ ধ'রে নয়নজলে সাগর তৈরী কর্‌ছি,—তবু তোমার দয়া হবে না?—তুমি যদি পায়ে ঠেল, তবে এই দীনহীনাদের স্থান

কোথায়?—বিরক্ত হ'চ্ছ—তোমার শান্তি ভাঙছি ব'লে?—তা' হও, শত শত বিধবা রমণীর চির-অশান্তির বিনিময়ে তোমার ক্ষণিক অশান্তি তুমি অনায়াসে সহ্য করতে পারবে! তুমি যে বড় দয়ালু! বিরক্ত হ'চ্ছ না—ঘৃণা ক'রছ? কেন? আত্মপক্ষের করুণাপ্রার্থী না হ'য়ে, পরপক্ষের করুণাপ্রার্থী হ'য়েছি ব'লে?—আত্মপক্ষের শক্তি যে বড় কম! যা' আছে, তা'তেই সন্তুষ্ট থাকতে বলছ? কিন্তু তারা যে তা'ও দিচ্ছে না! কত দিন—কত মাস—কত বৎসর বিনিদ্র-নয়নে, কাতর ক্রন্দনের অশ্রুজলে ভেসে, করুণ-কণ্ঠে প্রার্থনা ক'রেছি—সাড়া দেয়নি; গভীর আর্ত্তনাদ ক'রে পৃথিবী প্রকম্পিত ক'রেছি,—কথা কয়নি; আকুল চীৎকার ক'রে গগন বিদীর্ণ ক'রেছি—চেয়ে দেখেনি; দুর্ব্বাসার মত ক্রুদ্ধ হ'য়ে অভিশাপ দিয়েছি—কেঁপে ওঠেনি;—নিষ্প্রাণ হিমাদ্রীর মত নিশ্চল নিস্পন্দ হ'য়ে কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা যাচ্ছে! এমন একদিন ছিল, যে দিন তার প্রাণে ঝরণার মত সতত স্নেহ ঝরত; সে স্নেহ, নদীর আকার ধারণ ক'রে পৃথিবীর একপ্রান্ত হ'তে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হ'য়ে, জীবজন্তু বৃক্ষলতাকেও বিতরণ ক'রত; কিন্তু আজ তার প্রাণের সে ঝরণা শুকিয়ে গিয়েছে!—সে প্রাণে একবিন্দুও স্নেহ নেই, প্রেম নেই, দয়া নেই, আজ সে প্রাণ নীরস, শুষ্ক, মরুভূমি! তবে জ্বল, জ্বল বিধবা-কামিনী, তুষানলে জ্বল। তোমাদের যে কেউ নেই,—আপনার বলতে কেউ নেই,—আছে শুধু অশ্রুজল! মরণকাল পর্য্যন্ত সেই-ই তোমাদের সাথী,—তোমাদের সম্বল!"

বিবাহ-বাটীর বাজনা শুনিয়া চামেলীও কাঁদিল, কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিল,—পনের বৎসরে লতিকার বিবাহ হইতেছে, আর তাহার এই পনের বৎসরের মধ্যে পতি-প্রাপ্তি—পতিসুখ—পতি-বিয়োগ—জীবনের সব কয়টি ভূমিকারই অভিনয় করা হইয়া গেল!

সন্ধ্যার সময় পার্শ্বের বাটীতে বাজী-বাজনা লইয়া মহা ধূমধাম করিয়া বর আসিল। চামেলীর বক্ষ ধপ্ ধপ্ শব্দে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে ভাবিল, লতিকার বর আসিল,—লতিকা কত সুখী হইবে—আর সে? তাহার বর ত' আর এ জীবনে আসিবে না!

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল—লতিকা যদি বিধবা হয়? তবে ত' তাহারও তাহারই মত বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে! না, না, সে যেন বিধবা না হয়! ভগবান যেন কাহাকেও বিধবা না করেন! কেহ যদি তাঁহার রাঙ্গা-চরণে অপরাধ করে, তবে তাহাকে যেন তিনি অন্য শাস্তি দেন—বিধবা না করেন! কাহারো শত্রুও যেন বিধবা না হয়! বিধবা হ'লে যে বড় জ্বালা!—বড় যন্ত্রণা!

২৩

সে দিন সন্ধ্যার পর নন্দকুমার চামেলীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল,—চামেলী শুইয়া পড়িয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কি যেন কি ভাবিতেছে। নন্দকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চামেলী তাহাকে বসিতে বলিল।

নন্দ তাহার শয্যার একপার্শ্বে বসিয়া কহিল, "দিদি! দিনরাত অমন-ভাবে একা একা বসে চুপ ক'রে ভেবে ভেবে শরীরটাকে নষ্ট করলে ত' চল্‌বে না! তা' হ'লে ত' জীবনের কর্ত্তব্য করা হবে না!"

চামেলী সে কথার উত্তর দিল, "বিধবার আবার কর্ত্তব্য কি? নারীর কর্ত্তব্য, সে যে একজনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হ'য়ে গিয়েছে!"

"পতি-সেবাটাই না হয় অদৃষ্ট থেকে লোপ পেয়েছে, কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ী, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এঁদের সেবা করাটা ত' উঠে যায়নি!"

"হ্যাঁ, তা' যায়নি বটে, কিন্তু ভাই! আমার আর শক্তি নেই—

কোন কর্ম্মে ইচ্ছা নেই! এক জনের সঙ্গে সঙ্গে যে, আমার শরীরটা অলস,—অবশ—অসাড় হ'য়ে পড়েছে! এই যে দেহটা দেখ্‌ছ—এর মধ্যে কোন শক্তি নেই,—উদ্যম নেই,—ইচ্ছা নেই,—এটা যেন একটা শাঁসহীন খোসা!"

"তা' হ'লে ত' চল্‌বে না! এই কর্ম্মময় সংসারে অলসের মত ব'সে থাক্‌লে, অশান্তি ছাড়া শান্তি ত' পাওয়া যায় না! অলসের মত ব'সে থাক্‌লে, কেবল স্বামীর কথা মনে আস্‌বে—আর মনে বড় আঘাত লাগ্‌বে! কাজ নিয়ে থাক্‌লে, কাজের দিকে মন যাবে, এ চিন্তাটা একটু কম আস্‌বে। সব সময়েই কাজ নিয়ে থাক্‌তে হবে; অন্য কাজ ন থাক্‌লে চরকা নিয়ে, একমনে সূতা কাট্‌তে হবে। সেই সূতা দিয়ে, কাপড় বুনে নিজে পর্‌লে অথবা কাউকে দান কর্‌লে, কত আনন্দ লাগ্‌বে! কিশোর-যৌবনে যারা বিধবা হয়, তাদের অনেক বিপদের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সেই বিপদ হ'তে উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন। এই প্রলোভন-পূর্ণ সংসারে মানুষ মানুষের অপকার ব্যতীত উপকার কর্‌তে আদৌ চায় না। পতিহারা হ'লে কি কি কঠোর নিয়ম পালন কর্‌তে হবে, সে গুলির ব্যবস্থা বেশ আছে, কিন্তু কেমন ভাবে পালন কর্‌তে হবে, সেটার ব্যবস্থা একেবারেই নাই। অনভিজ্ঞ বিধবা কিশোরীদের সে ব্যবস্থা নিজেদেরই ক'রে নিতে হবে। এ শিক্ষাটা পিতা, শ্বশুর, ভ্রাতা, দেবর দ্বারা পা'বার কোন আশাই নাই। তাঁরা কোথায় বিধবাদের শিক্ষা দিয়ে, তা'দের মনে সর্ব্বদা পবিত্রতা দিয়ে সুপথে নেবেন, তা' নয়, তাঁরা সময় সময় অনেক রকম কুশিক্ষা দিয়ে, তাদের মনের আত্মলব্ধ সংযমটুকুও ভেঙ্গে দিয়ে কুপথে নিয়ে চলেন। এমন সংসারে থেকে কি স্বামী-সুখাস্বাদনকারিণী অল্পবয়স্কা বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর্‌তে পারে? পার্‌ত, যদি শিক্ষা থাক্‌ত! শিক্ষা ত' নেই! সায়ের উপর

ভাইবোন্ প্রভৃতিকে প্রমোদ-সাগরে ভাস্‌তে দেখে, নব-যৌবন-সম্পন্ন বিধবারা কি সংযমের বাঁধ ঠিক রাখ্‌তে পারে? প্রকাণ্ড নদীর ক্ষুদ্র বাঁধ বর্ষার জলপ্লাবনের আঘাতে কতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির থাক্‌তে পারে? ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন কর্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই মন পবিত্র হয় না, সে মনে তখনও কু-ভাব আসে। বহুদিন ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়মাদি পালন কর্‌বার পর মন কতকটা পবিত্রতা শিক্ষা করে। ব্রহ্মচর্য্য সাধনার প্রথম অবস্থায় সর্ব্বদা কাজ নিয়ে থেকে নিজেকে অন্যমনস্ক রাখ্‌তে হয়। সাধারণতঃ অবসর-সময়েই মনটা কুপথের দিকে অগ্রসর হয়। রাত্রি-বেলাতেই মানুষ অবসর গ্রহণ করে,—এই সময়টাই খারাপ। কাজেই, কাজ কর্‌তে কর্‌তে যখন ঘুমে চোখ ভেঙ্গে আন্‌বে, তখনই ঘুমান উচিত। আবার ঘুম ভাঙ্গলেই শয্যা ত্যাগ ক'রে কাজে প্রবৃত্ত হ'তে হবে। জাগ্রত-অবস্থায় আদৌ অবসর নেওয়া ঠিক্ নয়। সব সময়ই কাজের ওপর থাক্‌তে হবে।—কিন্তু বাঙ্গালার আজ দুরদৃষ্ট যে, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে নারীর কাজ বিলাসিতায় পরিণত হ'য়েছে!"

"যে নারী স্বামীকে একদিন ভালবেসেছে, সে নারী কি কখনও কুচিন্তাকে মনে স্থান দিতে পারে?"

"প্রলোভন আর যৌবন এ দু'টো দস্যু মিলিত হ'য়ে মানুষের না কর্‌তে পারে কি? পুরুষেরা কিছু কর্‌লে, কিছুই আসে যায় না, কিন্তু নারীর যে যথাসর্ব্বস্ব হরণ ক'রে তার প্রকাণ্ড একটা সর্ব্বনাশ ক'রে রেখে যায়! সমাজে পুরুষেরাই স্বাধীন, এবং পুরুষেরাই সমাজের পরিচালক, তাই পরাধীনা নারীদের উপর এই অবিচার! শিক্ষিত পুরুষেরা অন্যায় কর্‌লে কেউ তা'দের উপর চোখ রাঙ্গাবে না, কিন্তু অশিক্ষিত নারীরা একটু অন্যায় কর্‌লে তাদের শাস্তি—আত্মীয় কুটুম্বের, এমন কি মাতা পিতার সংস্রব চিরদিনের তরে ত্যাগ! তখন সেই অভাগিনীরা হয় আত্মঘাতিনী

হয়, না হয় বারাঙ্গনা-গৃহে বাস করে! কুলাঙ্গনার পবিত্র অন্তঃপুর হ'তে তারা চিরতরে বিতাড়িত হয়! আজ তোমার যৌবন এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয় নাই, তাই তুমি উপলব্ধি করতে পারছ না, অথবা স্বামীর স্মৃতি এখনও তোমার সাম্নে জাজ্বল্যমান, তাই তুমি বুঝতে পারছ না—বিধবা-জীবন অতিবাহিত করা কত কষ্ট—কত দুরূহ!"

ভীতস্বরে চামেলী কহিল,—"না, না, ভগবান যেন আমাকে এমন না করেন! স্বামীর স্মৃতি চিরদিন যেন আমার চোখের সাম্নে এম্‌নি উজ্জ্বল হ'য়ে ভাসে!"

"আমরাও ত' দিনরাত ভগবানের কাছে তাই প্রার্থনা করি। প্রলোভন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখ্‌বার একমাত্র উপায়—সতত নিজেকে কর্ম্মের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা, আর সেই করুণাময় জগৎপাতা পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা ডাকা! সমাজ যদি বিধবাদের জন্য অন্য বন্দোবস্ত করে, তবে বিধবাদের এত কষ্ট হয় না!"

"কি বন্দোবস্ত?"

"আজকাল বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্তি করাই যখন সংসারের প্রধান কর্ত্তব্য হ'য়েছে, তখন যেখানে এই বাসনার বাষ্প না যায়, অর্থাৎ সংসার থেকে দূরে বিধবাদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত ক'রে, জিতেন্দ্রিয় প্রাজ্ঞ বৃদ্ধদের দ্বারা তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। সমাজের ইচ্ছা থাক্‌লে বিধবারা যা'তে সুখে থাক্‌তে পারে, তা' অনায়াসেই করতে পারে। কিন্তু সমাজ ত' তা করবে না! সমাজের আছেই বা কি ছাই! যে সমাজ অলস অকর্ম্মণ্য স্বার্থপর পুরুষদ্বারা পরিচালিত—সে কি একটা সমাজ? স্বাধীনতার সময় পূর্ব্বপুরুষেরা সমাজের যে নিয়মাদি সৃষ্টি ক'রে রেখে গিয়েছেন—আজ পর্য্যন্ত সেই নিয়মই চ'লে আস্‌ছে। জগতের পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে, কিন্তু সমাজের নিয়মের পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে না,—এমন হ'লে কি চলে? তাই

নব্য যুবকবৃন্দ সমাজের শাসনের মস্তকে সজোরে পদাঘাত ক'রে, নিজেদের বিবেচনায় যেটা ভাল, তাই করছে। আর পরাধীনা বিধবারা ডানাকাটা পাখীর মত ছট্‌ফট্‌ ক'রে কত কষ্ট পাচ্ছে!"

"স্বাধীনতার সময় কি বিধবাদের কোন কষ্ট ছিল না?"

"না; তখন বিধবা-বিবাহও ছিল, সতীদাহও ছিল। যা'দের ইচ্ছা হ'ত, তারা পুনরায় বিবাহ ক'র্‌ত, আর কেউ কেউ স্বামীর জ্বলন্ত 'চিতার ওপর হাসতে হাস্‌তে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, তাকে জড়িয়ে ধ'রে, তার সঙ্গে সেই অনন্তধামে চ'লে যেত! পরাধীনতার কিছু পূর্ব্বে বিধবা-বিবাহ উঠে গেল। তারপর পূর্ণ পরাধীন হ'লে সমাজ সতীদাহও উঠিয়ে দিতে বাধ্য হ'ল। সতীদাহ না উঠ্‌লে ত বিধবাদের আর্ত্তনাদ, হাহাকার দিনরাত শুন্‌তে হ'ত না! পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ এত নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠেছে যে, এই করুণ আর্ত্তনাদ, বুকফাটা হাহাকার শুনেও তার প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা করতে, সমাজের একবিন্দুও দয়া হয় না—একটুও চোখের জল পড়ে না! এই যে কত বিধবারা প্রলোভনের স্রোতে প'ড়ে সমাজের মুখে কলঙ্কের কালিমা লেপন করছে—মানের ভয়ে, নির্দ্দয় কঠোর হ'য়ে, চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে নিজের রক্ত দিয়ে তৈরী কত শত ভ্রূণ-হত্যা করছে!—সমাজ কি এসব দেখ্‌ছে না?—জান্‌ছে না? সব দেখ্‌ছে—সব জান্‌ছে! প্রতিকার করছে না—শুধু অলসতার জন্য! পরাধীনতাই অলসতার কারণ! কোন স্বাধীন সমাজ যদি এর প্রতিকার করে, তবে এ সমাজ অবনতমস্তকে সেটা মেনে নেবে। পরাধীনতা বাঙ্গালাকে এমন ক'রে তুলেছে যে, তার খাওয়াটা যদি অন্যে খেয়ে দেয়, তবে তার বড়ই সুবিধা হয়।"

"বিধবাদের এই ভ্রূণ-হত্যা মহা অপরাধের হাত থেকে রক্ষা করতে, প্রতীকারের কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে?"

"বিধবাদের বিয়ে দেওয়া।"

"আবার বিয়ে? সমাজ এ নিয়মটা উঠিয়ে দিয়েছে—ভালই হ'য়েছে। তার যদি সুখ হ'ত, তবে প্রথম বিবাহেই হ'ত। কপালে সুখ নেই!—যে নারী হৃদয়ের সমস্তটুকু ভালবাসা দিয়ে একজনকে ভালবেসেছে—সে কেমন ক'রে অন্যকে আবার ভালবাসবে?"

"কাম বড় ভয়ঙ্কর জিনিস! ও না করতে পারে—এমন কাজ নেই। স্বামীর পবিত্র স্মৃতি ভুলিয়ে দিয়ে নারীর সতীত্ব নষ্ট করতে একটুও দ্বিধা করে'না! ঐ কামের বশীভূত হ'য়ে, কত কুলনারী সধবা থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজনের উন্নত মস্তক নত করছে—কত ধনী-কন্যা ঘৃণিত অস্পৃশ্যের সঙ্গে বারাঙ্গনার ব্যবহার করছে—কত বিধবা সম্মুখ ভবিষ্যতের বীভৎস ছবি দেখেও অম্লান-বদনে আগ্রহের সহিত আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করছে! কাম মানুষকে অন্ধ ক'রে দেয়! কামান্ধ মানুষ কি না করতে পারে? প্রয়োজন হ'লে, অবলীলাক্রমে মানুষের বক্ষে ছুরিকা বসাতে পারে! স্ত্রী-পুরুষের ভেতর অধিকাংশ পুরুষই মোহাভিভূত এবং কামান্ধ হয় বেশী। সুতরাং নারীদের এক স্বামী ব্যতীত অন্য কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। কামান্ধ পুরুষ বন্যার মত নিষ্ঠুর হ'য়ে নিত্য নূতন লোমহর্ষণ ব্যাপারের অবতারণা করছে। নারীরা এমন ঘটনা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করছে—তবু কেন তারা পতঙ্গের মত পুরুষের মোহানলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ছে?—কামের প্রবল তাড়নায়! এ সংসারে পুরুষের পথটি বড় পরিষ্কার—বড় প্রশস্ত—বড়ঃশুষ্ক। তা'দের চঞ্চল হ'লে বিশেষ কিছুই আসে যায় না, কিন্তু নারীর পথ অতি সঙ্কীর্ণ—অতি পিচ্ছিল—অতি দুর্গম। তাদের মনে একটু চঞ্চলতা প্রবেশ করলেই যে সর্ব্বনাশ! গভীর আঁধারাবৃত গহ্বরে পতন! উত্থানের পথ চিরতরে রুদ্ধ! এ প্রলোভনপূর্ণ-সংসারে পুরুষ যখন স্বাধীন, উচ্ছৃঙ্খল, তখন পরাধীন নারীদের পতিহারা হ'য়ে থাকা যে কি বিপদের,

তা' সবাই প্রতিদিনই লক্ষ্য করছে। এদের যদি আবার বিয়ে দেওয়া যায়, তবে সমাজের কাছে—এ কলঙ্কের পশরা, ঈশ্বরের কাছে—এ পাপের বোঝা কিছু ক'মে যায়!"

"আবার বিয়ে! এ যে বড়—এ ছাড়া কি অন্য উপায় নেই?"

"আছে; তবে এই উপায়ই সহজসাধ্য। কিন্তু এই উপায়ই যখন সমাজ প্রচলন ক'রছে না, তখন সে উপায়ের কল্পনা করা, উন্মাদের আকাশ-কুসুম ভাবা মাত্র।"

"কি সে উপায়?"

"তা' ত আগেই ব'লেছি—সংসারে বিধবাদের না রেখে, যেখানে প্রলোভনের দূষিত বায়ু নেই—সুশিক্ষা আছে, নারীর কাজ আছে, এমন স্থানে রাখ্তে পার্লে হয়। তা' ত সমাজ প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'সে আছে—কখনই কর্বে না। অলস, পরাধীন পুরুষ যে সমাজের পরিচালক, সে সমাজে এমন চিন্তা করা—শূন্যে দুর্গ নির্ম্মাণ। অলসেরা যদি এমন সৎকার্য্য করে, তবে যে তাদের আলস্য ত্যাগ ক'রে কর্ম্মঠ হ'তে হয়! দেশটা দিন দিন নরকের পথে চ'লেছে। মা-লক্ষ্মীর কৃপা ধীরে ধীরে হ্রাস হ'য়ে, মা-ষষ্ঠীর কৃপায় পূর্ণ হ'য়ে উঠ্ছে। হায়রে অধঃপতন! হায়রে হিন্দু-কুসন্তান! একদিন এই দেশের মানুষেরা দেবতার চেয়েও চরিত্রবান্ ছিল; কিন্তু আজ তারা শয়তানের চেয়েও চরিত্রহীন হ'য়েছে! এই দেশেতেই ভীষ্মদেব, শ্রীচৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষের জন্ম হ'য়েছিল! আর আজ? যে মা' একদিন রত্ন-প্রসবিনী ছিল, আজ সে মা' কি ক'রে তার গর্ভে এই কুলাঙ্গারগণের স্থান দিচ্ছে? না, না, মায়ের দোষ কি? মায়ের সন্তানদেরই বা দোষ কি? পরাধীন যারা, তারা কুলাঙ্গার না হ'য়ে হবে কি? স্বাধীনতা ত' নেই যে, কাজ থাক্বে—দেশরক্ষা কর্তে হবে, খাবার ব্যবস্থা করতে হবে! দেশ বেশ আছে! বড় শান্তিতে

আছে! কোন ঝঞ্ঝাট নেই, খাবার চিন্তা নেই, মারামারি কাটাকাটি নেই, রক্তারক্তি নেই,—বেশ নিরাপদে আছে, কোন চিন্তাও নেই, কোন কাজও নেই! কিন্তু মানুষ বিনা চিন্তায় অথবা বিনা কাজে কখনও থাকৃতে পারে না; সুতরাং তারা আলস্যের উপাসনা—নিদ্রা, আলস্যের চিন্তা—কুচিন্তা, আলস্যের কাজ—বিন্দুপাত করে! অনেকে 'স্বাধীনতা স্বাধীনতা' ক'রে চীৎকার করৃছে।—কেন হে? দেশ ত' বেশ আছে—কোন গোল নাই! স্বাধীনতা এলেই কত হাঙ্গাম! "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" করৃতে দেবে না—বিরহের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শিক্ষা করৃতে হবে—যুদ্ধে যেতে হবে—মরৃতে হবে! মেয়েদের আর্ত্তের আশ্রমে আহত সৈনিকদের সেবা করৃতে যেতে হবে—কি অভিশপ্ত বিচ্ছেদ! মিলন হয় ত' চিরতরে ভেঙ্গে যাবে!—আলস্য কথাটা অভিধান থেকে একেবারেই তুলে দিতে হবে!—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নন্দকে নীরব হইতে হইল। কারণ সেই সময় এক ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া চামেলীকে একখানা পত্র দিল, এবং নন্দকুমারকে আহারে আসিবার জন্য আহ্বান করিল।

নন্দকুমার আহার করিতে গেল। চামেলী পত্রখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

২৪

পত্রখানি চামেলীর শ্বশুরালয় হইতে তাহার জ্যেষ্ঠ-যা' তাহাকে দিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল—

স্নেহের বোন্!

অনেকদিন হ'তে ভাবৃছি,—তোমার কাছে পত্র দেব। কিন্তু লিখ্তে গেলেই তপ্ত-অশ্রু আমার চোখের দৃষ্টি-শক্তিকে রুদ্ধ ক'রে কাগজ ভিজিয়ে

দেয়! আজও অনেকবার দৃষ্টি-শক্তি বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল—অনেক কাগজ নষ্ট হ'য়েছে!

যে যাবার, সে চ'লে গিয়েছে। তার জন্য ত' কাঁদ্‌লে আর তা'কে ফিরে পাবে না বোন্!

আমি তোমাকে নিজের সহোদরার মত দেখি। তোমার যা' হ'য়েছে, তার জন্য শুধু তোমার মনেই যে দারুণ ব্যথা লেগেছে, তা' নয়—আমার মনে, বোধ হয় তোমার ব্যথার চেয়ে কম ব্যথা বাজেনি! তোমায় আশীর্ব্বাদ করি—জীবনের শেষ ক'টা দিন তোমার স্বর্গীয় আরাধ্য দেবতার পূজা স্থিরভাবে একমনে ক'রে যেতে পার!

তুমি এখানে এস বোন্!—শীঘ্র ক'রে এস! তুমি এসে, তোমার ছেলেকে কোলে তুলে নেও! এতদিন ধ'রে সে তোমাকে 'কাকী-মা' ব'লে ডেকেছে, কিন্তু এখন থেকে সে তোমাকে 'মা' ব'লে ডাক্‌তে শিখেছে! তোমার ছেলে, তুমি না কোলে নিলে, কে কোলে নেবে বোন্?

এখানে তোমার কোন অসুবিধা হবে না! আমি যতদিন এ সংসারে আছি,—ততদিন তোমাকে কেউ কিছু বল্‌তে পার্‌বে না! এস বোন্! তুমি না আস্‌লে যে আমি তোমার ছেলেকে নিয়ে একা পেরে উঠ্‌ছি না বোন্!

এ বাটীর সবাই ভাল আছেন। তোমাদের মঙ্গল দিও। আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—

আঃ—তোমার দিদি শান্তা।

চামেলী পত্র পড়িতে পড়িতে কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে তিন চারিবার পত্রখানা পড়িল। তাহার পর নয়নের জল মুছিয়া, পত্রের উত্তর লিখিতে বসিল। কি লিখিবে,—কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া নীরবে ভাবিয়া, অতি মনোযোগসহকারে লিখিতে বসিল।

চামেলী লিখিল—

শ্রীচরণকমলেষু—

সংখ্যাতীত প্রণামপূর্ব্বকনিবেদন মিদং

দিদি! আপনার পত্র আজ পেলাম। আমাকে যাবার জন্য লিখেছেন আমার যাবার কোন আপত্তি নেই। সে আপত্তি থাক্‌তেও পারে না। কারণ, নারীর কাছে পৈতৃক ভিটার চেয়েও স্বামীর ভিটা অনেক বেশী আদরের সামগ্রী। কিন্তু বাবার নিকট কি ক'রে আমি নিজে, আমার যাবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করি? আপনি কাউকে দিয়ে বাবাকে ব'লে আমায় ওখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।

দিদি! আপনি লিখেছেন যে, আপনি যতদিন জীবিত থাক্‌বেন, ততদিন আমার কোন কষ্ট হবে না। কিন্তু দিদি! বিধবাদের কি কেউ আছে? নারীর পতিই যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ,—পতিই যে আরাধ্য দেবতা,—পতিই যে তার জীবন! পতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে নারীর সকল সুখ সকল শান্তি, সকল আনন্দ, সকল উল্লাস চিরদিনের জন্য নিভে যায়; স্বামীর মরণের সঙ্গে সঙ্গে মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, শ্বশুর-শাশুড়ী, ভাসুর দেবর সবাই যে বিমুখ হন!

দিদি! বিধবাদের কি কেউ দু'চোখ পেড়ে দেখ্‌তে পারে? একে তাঁরা স্বামীর শোকে উন্মাদ, তার ওপর তাদের হৃদয়ে আরও জ্বালা দেওয়া হয়,—অলপ্পেয়ে, অলক্ষণে, স্বামী-খাকী ব'লে! পুরুষেরা অন্য সমাজের কাছে বুক টান ক'রে উঁচু-গলায় বলেন,—আমাদের বিধবারা দেবীর মত জীবন যাপন করে, সুতরাং তারা দেবী।—কিন্তু সেই দেবীদের বিবাহ-আদি কোন শুভ উৎসবে যোগদান করতে নিষেধ করেন,—পাছে কোন অকল্যাণ হবে ভেবে! মনে মনে রাক্ষসী ভেবে, অন্যের কাছে দেবী বলায় লাভ কি? একে বিধবারা পতি-বিয়োগে মৃতপ্রায় হ'য়ে

থাকে, তার ওপর তাদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার ক'রে, তাদের হৃদয়ে দারুণ ব্যথা দিয়ে তাদের কাঁদাতে সমাজ এত ভালবাসে কেন? তারা সতত সমাজের এম্‌নি ভাবে অবজ্ঞেয়, হেয়, ঘৃণ্য হ'য়ে বাস ক'র্‌বে!—এম্‌নি ভাবে থাক্‌বার জন্য বিধবাদের কি এক দণ্ডের জন্যও বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছা করে, না হয়?

আত্মহত্যার অনেক উপায় আছে। সংসারে এত জ্বালা সহা অপেক্ষা, সেই সব উপায় অবলম্বন করা কি ভাল নয়? কিন্তু সে সকল উপায় বিধবারা অবলম্বন করে না কেন—জানেন?—তারা যদি আত্মঘাতিনী হয়, তবে তাদের মাতাপিতা অথবা শ্বশুর শাশুড়ী পুলিশের নির্য্যাতনের মধ্যে পড়ে। মাতাপিতা শ্বশুর শাশুড়ীকে এরা যেমন ভালবাসে, তেমন প্রতিদান পায় না। অবিচার সহ্য ক'রে কাঁদতেই বুঝি বিধবাদের জন্ম!

যদি সতীদাহ না উঠে যেত, তবে কি আজ বিধবাদের এমনভাবে তিলে তিলে জ্বালা সহ্য করতে হ'ত? বিধবাদের যে কি জ্বালা, তা'ত দিদি লিখে জানান যায় না! ভাষায় কহা যায় না! এই বুকখানা যদি চিরে দেখেন, তবে দেখ্‌তে পাবেন—দিনরাত কি ভীষণ ঝড় এই বুকখানার মধ্যে বইছে! এমনিই যে আমাকে সারা-জীবন ভোগ করতে হবে! জীবনের যে এখনও অনেক বাকী দিদি!

বাপ ভাই শ্বশুর ভাসুরদের দোষ দিই কেন জানেন?—সমাজের কর্ত্তা তাঁরা। তাঁরা যদি ইচ্ছা করেন, তবে সমাজকে অন্যভাবে গড়্‌তে পারেন, অথবা বিধবাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু তাঁরা ত কোন কথাই বলেন না! বল্‌বেন কেন?—পতিহারার যে কি জ্বালা, তা'ত তাঁরা বোঝেন না! আর বুঝলেও তাঁদের ত আর সে জ্বালা ভোগ করতে হয় না! অথবা তাঁরা বল্‌বেন—অদৃষ্টে আছে, খণ্ডাবে কে? এ অদৃষ্ট ত তাঁরাই করেছেন! এই প্রলোভনপূর্ণ সংসারে বিধবাদের স্থান কোথায়

গুরুজনেরা তাদের বাসস্থান কোথায় নির্দ্দেশ ক'রেছেন?—ভোগবিলাসের মধ্যে বিধবাদের বাস ক'রে সংযমী হ'তে হবে! জানি না, জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানী ব্যক্তি ভোগবিলাসের মধ্যে থেকে সংযমী হ'তে পারেন কি না? কিন্তু অল্পবয়স্কা অজ্ঞ বিধবাদের প্রলোভনের মধ্যে থেকে সংযমী হ'তে হবে।

কেমন ক'রে সংযমের পথে চল্‌তে হয়, তা' কেউ বল্‌বেন না, মাত্র বল্‌বেন—'সংযমী হও।' তাঁরা সংযমী হ'তে ব'লেই, নিজেরা এই অনভিজ্ঞা চঞ্চলা বিধবাদের সম্মুখে আমোদপ্রমোদে এবং ভোগবিলাসে সময় অতিবাহিত করেন। অল্পমতি বিধবারা ইহাতে কি শিক্ষা পায়?

গুরুজনেরা যদি আমোদ প্রমোদ, ভোগ বিলাসে মত্ত না থেকে, না থাক্‌তে পারেন, তবে বিধবাদের স্থান সংসার হ'তে দূরে কর্‌লেই হয়—যেখানে ভোগ বিলাসের গন্ধ নাই, আছে নারীর কাজ।

এ সংসারে কি নারীর কাজ আছে? কাজের মধ্যে রাঁধা, খাওয়া, ঘুমোন—এ গুলি ত' নারীর কাজ নয় দিদি! নারীর কাজ পরাধীন হ'বার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হ'তে বিদূরীত হ'য়েছে! স্বাধীনতা যখন এই দুর্ভাগা হিন্দুর ছিল, তখন এই সমাজের নিয়মাদির সৃষ্টি। কিন্তু এখন তারা পরাধীন; অথচ সমাজের নিয়মাদির পরিবর্ত্তন কিছুই হয়নি। নিয়মগুলি সেই স্বাধীনতা যুগের মতই আছে।

কাজ হাতে থাক্‌লে শোক ভোলা যায়। এই পরাধীন সংসারে এমন কোন কাজ নেই, যে কাজ বিধবার বিরাট্ হাহাকার থামাতে পারে।

লেখার অনেক আছে দিদি! কিন্তু লিখে ত' কোন ফল নেই! এই শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ের কথা শুনে কি কেউ প্রতিকারের চেষ্টা কর্‌বে?

অধিক লিখে আপনার মনে আঘাত দিতে চাই না। আশীর্ব্বাদ

কর্‌বেন, যেন চিরদিন আমি সৎপথে থেকে ভগবানের নাম সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌তে পারি। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

সেবিকা—আপনার স্নেহের বোন্
অভাগিনী চামেলী।

২৫

আহার করিয়া নন্দকুমার পুনরায় চামেলীর কক্ষে আসিয়া কহিল, "ও চিঠিখানা কোথা থেকে এসেছে দিদি?"

চামেলী কোন কথা না কহিয়া পত্রখানা নন্দকুমারকে পড়িতে দিল।

নন্দকুমার পত্রখানা পড়িয়া কহিল, "বিধবারা শান্তি পাবে কি ক'রে? সমাজ ত' তাদের তা' দেবে না? তা' হ'লে যে, তাদের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটে! আশ্রম ক'রে, সেখানে যদি বিধবাদের রাখা যায়, তবে আমি নিশ্চয়ই ব'ল্‌তে পারি, তারা প্রাণে এমন শান্তি পায়, যা' কেউ বিবাহিতা হ'য়ে পায় কিনা সন্দেহ! বিধবাদের আশ্রমে পাঠালে, সংসারের কাজ করে কে? একটা ঝি রাখ্‌তে গেলে, তার তিন বেলার খোরাক, পোষাক বাদে মাসে মাসে তার মাইনে! কিন্তু বিধবা ভ্রাতৃবধূ অথবা ভগ্নী সংসারে থাক্‌লে কত সুবিধে! মাত্র একবেলার খোরাক!—পোষাক বৎসরে মাত্র দু'খানা থানফাড়া ধুতি!—বিনা বেতন!—কি চমৎকার সুবিধে! এ সুযোগ কি মানুষ মানুষ হ'য়ে ছাড়ে! বিধবাদের থাক্‌বার স্থানের অভাব হয় না; বাপের-বাড়ীতে—ভায়ের সংসারে, শ্বশুর-বাড়ীতে—দেবর অথবা ভাসুরের সংসারে তাদের বাসস্থান সমাদরে নির্দ্দেশিত হয়, কিন্তু অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবিচার তাদের অম্লান-বদনে সহ্য ক'রে যেতে হয়! তাদের উপর অত্যাচার অবিচার উৎপীড়ন দেখ্‌বার ত' কেউ নেই! যার স্বামী

নেই," সমাজের কাছে তার কেউ নেই! তাই সমাজ তার ওপর অবাধে যথেচ্ছা ব্যবহার করে! বিধবার উপর এ অবিচারে উৎপীড়নে, পুরুষের চেয়ে স্ত্রীদের অপরাধই বেশী। নারীর ব্যথা নারী না বুঝ্লে, কি চলে? একটা জাতির দৈন্য সেই জাতির প্রত্যেকে না বুঝ্লে, সে কখনও উন্নত হ'তে পারে না! একটা বংশের মর্য্যাদা সে বংশের প্রত্যেকে না রাখ্লে, সে আর গৌরবান্বিত থাকে না! তেমনি নারীর মান নারী না ক্ষুণ্ণ করলে, নারী কি এমনি ভাবে নিপীড়িতা, নির্য্যাতীতা হ'ত?"

চামেলী স্থির হইয়া নন্দকুমারের কথা শুনিতেছিল। নন্দকুমার ক্ষণকালের জন্য নীরব হইয়া আবার বলিল, "তোমার কষ্ট হ'চ্ছে দিদি? হ্যাঁ, রাতও অনেক হ'য়েছে, তুমি এখন শোও।"

"না না, আমার কোন কষ্ট হ'চ্ছে না।"

"আমি একটা কথা ব'সে ব'সে ভাবি দিদি! মেয়েরা কেন পুরুষদের ঘৃণা করে না?—ঘরে সুন্দরী স্ত্রী স্বামী-চিন্তায় বিনিদ্র-নয়নে নৈশ-উপাধান সিক্ত ক'রে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করছে, আর স্বামী পশ্বাধম জন্তুর মত স্ত্রীর কথা ভুলে, মর্ত্তের নরক, বেশ্যালয়ে গিয়ে ইন্দ্রিয়-লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করছে! ওঃ! কি ঘৃণিত জঘন্য দৃশ্য! এ কথা স্ত্রীরা জেনে শুনেও কেন পুরুষদের ভালবাসে? ভক্তি করে? শ্রদ্ধা করে? মদিরাপানে মাতাল হ'য়ে পুরুষেরা যখন অসুস্থ স্ত্রীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে, নিরীহ স্ত্রীদের প্রহার করে, তখন কেন স্ত্রীরা সে অত্যাচার অম্লান-বদনে সহ্য ক'রে, নির্জ্জনে, নীরবে, গৃহকোণে বসে কাঁদে? তবু কেন স্ত্রীরা তাদের স্বামী ব'লে ভাবে? ওঃ! বাঙ্গালার কি দুর্দ্দিন! বাঙ্গালার অধিকাংশ পুরুষই স্ত্রীকে ভালবাসতে জানে না, নৈলে পঞ্চাশ ষাট বৎসর বয়সে, পুত্র পৌত্র (কাহারও বা দুই একটী বাল-বিধবা কন্যা) থাকা সত্ত্বেও সংসার অচল হয় ব'লে পুনরায় বিবাহ করত না!—"

নন্দকুমারের কথায় বাধা দিয়া, চামেলী একটী অতিদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মাগ-মরা শোক, সদ্দি-কাসী রোগ!"

চামেলীর এ কথায় নন্দকুমার বেশ একটু বেদনা হৃদয়ে অনুভব করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে আবার বলিতে লাগিল, "সতীত্বটা শুধু নারীদেরই পালন কর্‌তে হবে, পুরুষদের পালন করবার কথাটা সমাজে নেই, তা' থাক্‌লে কি পুরুষ এতদূর সেচ্ছাচারী হ'ত? অধিকাংশ পুরুষ স্ত্রীকে ভালবাসে কামের তাড়নায়, নৈলে কি তারা কখনও বল্‌তে পারে—সুন্দরী না হ'লে, বিয়ে করব না? নারীরা কোন দিনই পুরুষদের কাছে তাদের প্রাপ্য সম্মান পায় নি। চিরদিনই তারা পুরুষদের নিকট থেকে অবজ্ঞা পেয়ে এসেছে, চিরদিনই তারা পুরুষদের দ্বারা লাঞ্ছিত হ'য়ে এসেছে। এ সমস্ত অন্যায় সত্ত্বেও তারা পুরুষদের প্রাণের চেয়েও ভালবেসে এসেছে এবং এখনও বাস্‌ছে! কেন তারা পুরুষদের এত ভালবাসে,—এইটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে দিদি! আমি যদি স্ত্রীলোক হ'তাম, তবে আমি নিশ্চয়ই এই পুরুষ জাতটাকে ঘৃণা কর্‌তাম। তারা অবাধে ঘৃণা কর্‌তে পারে, আর তোমরা পার না? তারা অম্লান-বদনে বল্‌তে পারে,—কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ কর আর তোমরা অম্লান-বদনে ব'ল্‌তে পার না,—পুরুষ ত্যাগ কর? তারা কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ ক'রে মুক্তির পথ খোঁজে, তোমরা পুরুষ ত্যাগ ক'রে মুক্তির পথ খুঁজ্‌তে পার না? তারা চিরকুমার থেকে জগতের হিতসাধন কর্‌তে পারে,—তোমরা চিরকুমারী থেকে জগতের হিতসাধন কর্‌তে পার না? কেন তোমরা তাদের কথা অবনতমস্তকে মেনে চল? কেন তোমরা অন্ধের মত ওদের নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখা ধর্ম্ম মান? তোমরাও মানুষ, ওরাও মানুষ! তোমরাও ভগবানের সৃষ্ট, ওরাও ভগবানের সৃষ্ট। তবে কেন তোমরা, ওদের তোমাদের ওপর প্রভুত্ব কর্‌তে দেও? সংসারে

এবং জগতে ওদের চেয়ে তোমাদের আদর কম নয়, বরং বেশী। সংসারে সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দিয়ে আদর যত্ন ক'রে, প্রাণঢালা ভালবেসে, তোমরাই ত' শান্তির মধুর আলোক এনে দেও! জগতে মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য ক'রে স্নেহ করুণা দিয়ে, তোমরাই ত' সৃষ্টি বজায় রাখ! পুরুষের চেয়ে তোমাদের দিয়েই জগতের এবং সংসারের প্রয়োজন বেশী। তবু কেন তোমরা পুরুষের পরাধীন? একবার তোমরা সকলে মিলিত হ'য়ে, সমস্বরে চীৎকার ক'রে বল ত,—"আমরা স্বাধীন; পুরুষের পরাধীন আর থাক্‌ব না। পুরুষদের অত্যাচার, অবিচার, উৎপীড়ন, নির্য্যাতন, নিষ্ঠুরতা আর সহ্য কর্‌ব না; পুরুষদের আর অন্ধের মত বিশ্বাস কর্‌ব না।" তোমরা নিজেরা বেশ স্থির হ'য়ে একবার ভেবে দেখ,—পুরুষ তোমাদের কেমন হীনভাবে রেখেছে! কতখানি দীন ক'রে রেখেছে! ঘাড়থেকে তাদের অধীনতার জোয়াল ফেলে, মাথা উঁচু ক'রে একবার দাঁড়াও দেখি—দেখ্‌বে, তোমরাও তোমাদের ন্যায্য অধিকার পেয়েছ! চোখ মেলে একবার চেয়ে দেখ—অনেক সুসভ্য জাতির নারী, তাদের ন্যায্য অধিকার পেয়েছে! তারাও একদিন তোমাদের মত পরাধীন ছিল! তারাও একদিন তোমাদের মত সকল অন্যায় অত্যাচার সহ্য ক'রে প্রতিদানে পুরুষকে প্রাণঢালা ভালবাসা দিয়েছিল! কিন্তু আজ তারা স্বাধীন—পুরুষের চাইতেও স্বাধীন! এ দেশের পুরুষ যে শুধু বিধবাদের জ্বালা যন্ত্রণা দেয়, তা' নয়! কয়টী স্ত্রী বিবাহিত-জীবনে সুখী? কয়টী স্বামী তাদের স্ত্রীদের প্রাণে শান্তি দেয়? পুরুষদের একবার ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখ—কি নিষ্ঠুর—কি পাষণ্ড—কি নির্দ্দয়—কি হৃদয়হীন তারা! নারীর দুঃখের কাহিনী শুনেও তারা দুঃখিত হয় না—নারীর চোখের জল দেখেও তারা অশ্রু ফেলে না! নারীর কোন ব্যথার প্রতিকার তারা করতে চায় না—অথচ এই নারী তাদের মাতা, ভগ্নী, ভার্য্যা! বিধবা-

কিশোরী ভগ্নীকে গৃহে রেখে, তাকে সমস্ত সুখ থেকে বঞ্চিত ক'রে তারই সাম্‌নে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হ'তে বৃদ্ধ পিতা পর্য্যন্ত বিলাসিতার উৎকর্ষ দেখিয়ে ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ কর্‌বার জন্য গৃহকোণে পত্নীকে কাঁদিয়ে উন্মত্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে! তা' দেখেও কেন নারী পুরুষকে চায়? কেন নারী বলে না—"আমি এমন অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ, পশ্বাধমকে বিয়ে কর্‌ব না,—এমন নিষ্ঠুরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রাখ্‌ব না!"—এমন একদিন আস্‌বে, নিশ্চয়ই আস্‌বে, যে দিন নারী পুরুষকে চিন্‌বে! যেদিন নারী পুরুষকে ঘৃণা ক'র্‌বে—অবিশ্বাস কর্‌বে যেমন ঐ দেশের নারীরা—ঐ সুদূর পারাবারের পরপারের নারীরা করে! সে দেশের নারীরা এখন পুরুষের অধীন নয়! সে দেশে এখন এ দেশের মত "বউ ম'লে বউ পাবে হাজার, খোলা আছে সস্তা বাজার" নেই! সে দেশের মেয়েদের বিয়ে না বস্‌লে জাত যায় না! সে দেশের মেয়েদের বিয়ে দিতে কন্যার পিতার কাঁদ্‌তে হয় না! সে দেশের নারীরা এখন এ দেশের পুরুষের মত স্বাধীন, কিন্তু এদের মত এত নিষ্ঠুর না, কারণ, তারা একদিন নিষ্ঠুরতা সহ্য করেছিল,—নিষ্ঠুরতার জ্বালা বোঝে!"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নন্দকুমার নীরব হইল। চামেলী সশব্দে একটী নিঃশ্বাস ফেলিল। নন্দকুমার তাহাকে বলিল, "বল দিদি! এই নিষ্ঠুর স্বার্থপর পুরুষকে এখন থেকে ঘৃণা কর্‌বে! বল, তাদের কখনও ভালবাস্‌বে না! বল, তাদের কখনও কোন লহমার জন্যও বিশ্বাস কর্‌বে না! তারা না কর্‌তে পারে এমন কাজ নেই! তারা ছলে, বলে, অথবা কৌশলে রমণীর অমূল্য নিধি কেড়ে নিয়ে তাকে রাস্তায় বসাতে পারে! কিসের জন্য পুরুষকে বিয়ে করা? তারা চায়—কামিনী ত্যাগ ক'রে মুক্ত হ'তে! বেশ ত তাদের মুক্ত হ'তে দেও—তাদের গলগ্রহ না হ'লে কি তোমাদের দিন চল্‌বে না? নারীত্ব এখন ভুলে যাও! দূরে

দূরে থেকে মাতৃত্ব দিয়ে দেশটাকে ঢেকে রাখ! যদি এমন দিন আসে, যে দিন তারা নারীদের তাদের মত সমান অধিকার তুলাদণ্ডে মেপে দেবে—যে দিন তারা প্রতিদান দিতে শিখ্‌বে—সেই দিন আবার নারীত্ব বিস্তার ক'রে তাদের জড়িয়ে ধ'রো! আজ নয়!"

ঢং ঢং করিয়া তখন ঘড়িতে দুইটা বাজিল। নন্দকুমার বলিল, "ওঃ! কথায় কথায় রাত অনেক হ'য়ে গেছে দেখ্‌ছি—এখন শুয়ে পড় দিদি! বেশী রাত জাগ্‌লে শরীর অসুস্থ হ'তে পারে।"

২৬

বৎসরে তিন রাত্রির অধিক শ্বশ্রুবাটীতে বাস করিতে নাই। কিন্তু সান্ত্বনা বাক্যের দ্বারা শোকাকুল পরিবারকে প্রকৃতিস্থ করিতে নন্দকুমারের পূর্ণ দুই মাস শ্বশুরালয়ে থাকিতে হইল।

পূর্ণ দুই মাসের পর তাহার বাটী যাইবার দিন স্থির হইল। সে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চামেলীর কক্ষে প্রবেশ করিল।

চামেলীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—চামেলী চরকা ঘুরাইয়া সুন্দর সুতা কাটিতেছে। নন্দকুমারকে দেখিয়া সে সুতা কাটা বন্ধ করিয়া কহিল, "এখনি যা'বে নাকি?"

নন্দকুমার উত্তর দিল, "হ্যাঁ দিদি!"

"দু'দিন এসে মায়া বাড়িয়ে যাওয়া!"

"ঐ মায়াটাই ত আমাদের সর্ব্বনাশ কর্‌ল দিদি! একদিন এই তোমাদের জাতির মধ্যে ছিল,—সন্তানকে জননী শুষ্ক চোখে, হাসি-মুখে, অকম্পিত হাতে রণবেশে সজ্জিত ক'রে, আশীষ চুম্বন দিয়ে যুদ্ধে পাঠাতেন! স্বামীকে স্ত্রী রণসাজে সাজিয়ে জ্যোতিঃপূর্ণ-নয়নে হর্ষোৎফুল্ল-বদনে বিদায়

দিয়ে বল্‌তেন, পরাজিত হ'য়ে জীবন্ত ফিরে এসো না! কিন্তু আজ যুদ্ধের নাম শুন্‌লেই যূপকাষ্ঠে বাঁধা বলির ছাগের মত সবাই কাঁপ্‌তে থাকে! আজকাল প্রিয়জনের ক্ষণিক বিরহ সহাই দায়! মাতা সামান্য দিনের জন্য পুত্রকে বিদেশে পাঠাতে নয়নাশ্রু ফেলেন—স্ত্রী স্বামীকে কয়েক দিনের বিদায় দিতে প্রাণে দারুণ ব্যথা অনুভব করেন! মায়াটা দিন দিন এমন ভাবে বেড়ে চ'লেছে যে, প্রিয়জনের মৃত্যু-শোক সহ্য না কর্‌তে পেরে কেউ কেউ মরণের কোলে ঢ'লে প'ড়েছেন!"

"মায়া না থাক্‌লে কি সংসার চল্‌ত? সন্তান গুরুতর অপরাধ কর্‌লে মাতাপিতা ক্ষমা করে কেন? মায়ার জন্য ত? এই মায়া যদি না থাকৃত, তাহ'লে মাতাপিতা আর সন্তানের মধ্যে কোন বাঁধন থাকৃত না—কেউ কারো সঙ্গে মিলে-মিশে থাক্‌তে পার্‌ত না—কেমন একা একা—ফাঁকা ফাঁকা থাক্‌তে হ'ত! পরস্পরের সঙ্গে বাঁধন আছে ব'লেই সংসার! মায়া না থাক্‌লে কে এমন ক'রে বাঁধ্‌ত? সংসার ব'লে তা'হ'লে ত কোন স্থান থাকৃত না! সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর দেখা পাওয়া যেত!"

"মায়া না হ'লে সংসার চলে না ঠিক্‌, কিন্তু এত বেশী মায়া কি ভাল জীবিত অবস্থায় মায়ার বাঁধন দৃঢ় কর্‌তে হয়, কিন্তু সময় সময় কর্ত্তব্যানুরোধে সে বাঁধনটা একটু শিথিল কর্‌তে হয়—মৃত্যুতে সে বন্ধনটা একেবারেই ছেদন ক'রে ফেল্‌তে হয়!"

সশব্দে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চামেলী কহিল—"অতটা যদি কর্‌তে পার্‌ত, তবে দুঃখ কষ্ট শোক ব'লে কোন শব্দ অভিধানে থাকৃত না।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চামেলীকে এই কথা কহিতে শুনিয়া প্রাণে একটু ব্যথা উপলব্ধি করিয়া নন্দকুমার চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। চামেলীও কোন কথা বলিল না। কিয়ৎক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব রহিল।

ক্ষণকাল পরে, নন্দকুমার একটী দীর্ঘ টানা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চামেলীর দিকে চাহিয়া বলিল, "তা' হ'লে আমি এখন আসি দিদি!"

"ব'স না একটু, আর কতদিনে দেখা হবে!" এই কথাটি শেষ হইবা মাত্র তাহার অজ্ঞাতসারে, তাহার বক্ষাভ্যন্তর হইতে নাসিকার মধ্য দিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস সশব্দে বাহির হইয়া আসিল, তাহার দৃষ্টি উদাস হইল। ক্ষণকাল এইরূপ নীরব থাকিয়া হঠাৎ মৃদু চমকিয়া উঠিয়া সে বলিল, "ভাল কথা, সে গানটি লিখে দাও ত!"

"কোন্ গানটি?"

"বিদেশীর সাজে বিদেশীর কাজে স্বদেশী কেন গো যাবে?"

নন্দকুমার গানটি লিখিয়া দিল।

চামেলী কহিল, "সুর ক'রে গেয়ে যাও।"

নন্দকুমার সুর করিয়া গাহিল—

বিদেশীর সাজে, বিদেশীর কাজে,
স্বদেশী কেন গো যাবে?
নাই কি তাদের নিজের সাজ?
নাই কি তাদের নিজের কাজ?
না থাকে যদি—মরুক সবে,
কেহ না কখনও কাঁদিবে।
আছে কাপাস তুলা গাছ-ভরা,
হ'লে মা তোমার কাজ সারা,
দিনের বেলায় না ঘুমিয়ে,
চরকা ঘুরাও ব'সে।
হোক্‌না সুতা মোটা চিকণ,
না হোক্ তাহে মিহি-বসন,
(ওগো!) সেই ত আমার মিঠে বড়
যা' হয় আমার দেশে।

বাবা সকল! চাক্‌রী ছাড়, লাঙ্গল ধর,
মুক্তবাতাস পেলে শরীর ভাল হ'বে।
সাহেবের জুতার গুঁতা কেন মিছে খাবে!!

গান শেষ হইলে চামেলী উঠিয়া গিয়া তোরঙ্গ খুলিয়া একখানি খদ্দরের কাপড় বাহির করিয়া, নন্দর নিকট আসিয়া কহিল—"নূতন হাতের নূতন উপহার—খারাপ হ'লেও, তোমার অভাগিনী দিদির এই ক্ষুদ্র স্নেহোপহার নিতে, আশা করি তুমি ঘৃণা করবে না।"

"দিদি! তোমার এ উপহার আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। ঘৃণা করব এই জিনিসকে? এ যে মহার্ঘ্য মণিমুক্তা চাইতেও আমার কাছে মূল্যবান্! এ তুমি কবে বুন্‌লে দিদি?"

"আমি বুনিনি, সূতা কেটে তাঁতীর বাড়ী থেকে বুনিয়ে এনেছি

"প্রথম জিনিসটা গুরুজনকে দিতে হয় যে!"

"আমার এ কর্ম্মের গুরু যে তুমি ভাই! তুমিই যে আমাকে এ কার্য্যে দীক্ষিত ক'রেছ!"

"দিদি! আজ আমার মন থেকে একটা প্রকাণ্ড গুরুভার নেমে গেল। আমার মনে বেশ ধারণা হ'য়েছে যে, তুমি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি ভালভাবে কাটাতে পারবে!"

"ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনা কর ভাই! সে ম'রে গেলে ভেবেছিলাম—ভগবান নেই! ভগবান যদি থাক্‌তেন, তবে কি তার মৃত্যু হ'ত? আমরা যে কত কাকুতি মিনতি ক'রে আকুল-ক্রন্দনে ব্যাকুলিত হ'য়ে তার জীবন-ভিক্ষা ক'রেছিলাম! ভগবান যদি থাক্‌তেন—তবে কি এ সব বৃথা যেত? কিন্তু এখন দেখ্‌ছি—তিনি আছেন! নইলে চোখের সাম্নে যা' দেখ্‌ছি—সে সব সৃজন করল কে? যাঁর সৃজিত ঐ অনন্ত নভঃমণ্ডল, দিনের বেলায় সূর্য্যকিরণে ঝলসিয়ে উঠে—রাত্রি-বেলায় নক্ষত্রখচিত হ'য়ে

চাঁদের আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে! যাঁর সৃজিত ঐ গগনস্পর্শী হিমাদ্রী অচল অটল হ'য়ে, কত যুগ-যুগান্তর ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে! যাঁর সৃজিত ঐ জলপ্রপাত—অবিশ্রান্তভাবে অম্বুরাশি ঝর্ ঝর্ শব্দে কোথা হ'তে দিনরাত প'ড়ছে! যাঁর সৃজিত ঐ অবিরত কল্লোলিত নদ নদী—পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে চলেছে! যাঁর সৃজিত ঐ দিগ্‌দিগন্ত প্রসারিত ভৈরব গর্জ্জনে গর্জ্জিত আলুলায়িত তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র! যাঁর সৃজিত ঐ ফল-ফুল-শোভিত শ্যামল অরণ্য!—তাঁর ওপর আমি ক্রুদ্ধ হ'য়েছিলাম!—তাঁকে কত তিরস্কার করেছিলাম!—প্রাণের আশা মিটিয়ে তাঁকে কত অভিশাপ দিয়েছিলাম! এতদিন ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পাইনি—শুনতাম, তিনি আছেন, তিনি সকলের আরাধ্য, তিনি সকলের প্রণম্য! কিন্তু ভুলেও তাঁকে কোন দিন ডাকিনি!—কোন দিন তাঁকে স্মরণ ক'রে মাথা নোয়াইনি! এক সময় তাঁকে ডেকেছিলাম—স্বামীর যখন অসুখ ছিল! স্বামীর অসুখে তাঁকে অনেক ডেকেছিলাম!—তাঁর অদৃশ্য চরণে অনেক মাথা কুটেছিলাম!—তখন বিপদে প'ড়েছিলাম কিনা? তিনি বেশ শিক্ষা দিয়ে গেলেন,—জীবনে আর কোন দিন তাঁকে ভুল্‌ব না—এখন তিনিই যে আমার স্বামী! তিনি এখন আমায় যে পথে নিয়ে যাবেন, আমি অন্ধের মত সেই পথে যাব। নন্দ! ভাই! তুমি আমার জন্য প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাকে সকল সময় চোখে চোখে রাখেন!"

"দিদি! এ সংসারটা আমাদের পরীক্ষা-মন্দির। এখানে আমরা ভগবানের কাছে পরীক্ষা দিতে আসি। এ পরীক্ষায় সবাই-ই উত্তীর্ণ হ'তে পারে—যদি সবাই মন নিবিষ্ট ক'রে পরীক্ষা দেয়! কিন্তু মন ত' নিবিষ্ট কর্‌তে পারে না—কোলাহলের জন্য! এ জগতে ত' কেউ কারো সাহায্য করে না! সবাই সবাইকে সাহায্য কর্‌লে প্রত্যেকেই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌ত! মানুষ, মানুষকে সাহায্য কর্‌তে জানে না—

কেবল জানে বাধা দিতে। তোমাকে সাহায্য কর্‌বার ত' কেউ নেই দিদি! তোমার কাজে বাধা দিতে সবাইকে পাবে। দেখ্‌ছ ত' সংসার! কিন্তু তুমি জেনে রাখ দিদি! তোমার এ ভাই, তোমার মঙ্গলের জন্য সব কর্‌তে পারে—কর্‌বেও।" এই বলিয়া নন্দকুমার নীরব হইল।

চামেলী নন্দকুমারের কথার পর কিয়ৎক্ষণ নীরব, নির্ব্বাক্ থাকিয়া একটী দীর্ঘ উষ্ণশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তুমি তবে এখুনিই যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ দিদি!" বলিয়া নন্দকুমার যেমন ভাবে ছিল, ঠিক্ তেমনি ভাবে রহিল—নড়িল না। তাহার আরও কিছু বলিবার ছিল, কিন্তু সরমে বলিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সেই সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইয়া গেল—নৌকা প্রস্তুত। জোয়ার বহুক্ষণ আসিয়াছে। নদীতে ভাঁটা হইলে নৌকা বাহিতে বড় কষ্ট হইবে।

চামেলী ভৃত্যের কথা শুনিয়া নন্দকে বলিল, "তবে যাও ভাই! তোমার দিদিকে ভুলো না! একজন ত' জন্মের মত ভুলেছে!"

এই বলিয়া চামেলী একটী দীর্ঘ তপ্ত-শ্বাস ফেলিল। নন্দকুমারের নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। সে অশ্রু মুছিয়া কহিল, "দিদি! তুমি আমায় পর ভাব?"

"তোমায়?—কৈ না? তোমাকে যে আমি নিজের ভায়ের মত দেখি! আমার এই শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে তুমিই শান্তির আলো জ্বেলেছ! তোমাকে যে ছাড়তে ইচ্ছে হয় না ভাই!"

"আমারই কি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে দিদি!"

"তবে তুমি যেয়ো না ভাই!"

"না গেলে যদি চলুত, তবে নিশ্চয়ই যেতাম না। না গেলে যে হয় না দিদি! সম্মুখে ভীষণ কর্ত্তব্য, যা' আমাকে দিন-রাত রাক্ষসের মত তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে! আমায় যে যেতেই হবে দিদি! তবে যাবার

সময় একটা কথা ব'লে যাই—যা' বহুদিন থেকে বল্‌ব বল্‌ক ক'রেও বলা হয়নি,—দিদি! এ সংসারে সঙ্গী ছাড়া নারীর পথ চলা মুস্কিল! নারীর সঙ্গী তার স্বামী। কিন্তু যা'র স্বামী নেই—তার সঙ্গী যে কেউ নেই দিদি! কেউ একটু স্বার্থত্যাগ কর্‌তে পারে না—জানেও না! দিদি! জানি আমি, তুমি আমাকে আপন সহোদরের মত ভালবাস,—তাই আমি সাহস ক'রে তোমাকে বল্‌ছি,—দিদি! তোমার দুর্গম পথ সুগম কর্‌তে, তোমার স্নেহের ভাই যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌বে—যথাসাধ্য স্বার্থে বলি দিয়ে, তোমার প্রাণের ব্যথা, তোমার হৃদয়ের হাহাকার, তোমার নয়নের জল লাঘব কর্‌বে!"

এই বলিয়া নন্দকুমার ক্ষণকালের জন্য থামিল। চামেলী তাহার ভাসা ভাসা চোখ দুইটি দিয়া নন্দকুমারের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। নন্দকুমার আবার বলিতে লাগিল, "অন্ধকারাবৃত দুর্গম পথে সঙ্গী পেলে যেমন আনন্দ হয়, তেমনি সাহসও হয়। আমাকে তোমার আঁধার পথের সঙ্গী ক'রে নেও! তুমি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের আশ্রয় নিয়েছ—আমিও তোমার সঙ্গী হ'য়ে তোমার পথের পথিক হই!"

"তা' হ'লে যে—"

"তাকেও শিক্ষা দেব! চল দিদি! তিনজনে মিলে এ সংসারের আঁধারাবৃত পিচ্ছিল বন্ধুর পথ দিয়ে ঐ আলোকিত সজ্জিত স্থানে যাই!"

"না না, ভাই! তোমরা কেন আমার সঙ্গী হবে? তোমরা কেন আমার জন্য গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম ত্যাগ কর্‌বে?"

"কেউ ত নিজের জন্য জন্মগ্রহণ করে না দিদি! আমরা সবাই যে সবার জন্য!"

"না না, ভাই! তোমাদের কখনও আমি এপথে আসতে দেব না!"

"তা' হ'লে যে আমি বড় ব্যথা পাব দিদি! তোমাকে একা এপথে ছেড়ে দিয়ে আমি প্রাণে যে একবিন্দুও শান্তি পাব না!"

"নন্দ! স্নেহের ভাইটি আমার! যদি কোন দিন তোমার এই অভাগিনী দিদিকে এক লহমার জন্যও ভালবেসে থাক, তবে আমার এই কথাটা রেখ ভাই!—গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম ত্যাগ কোরো না! তুমি আমার সঙ্গী না হ'য়ে দূরে থেকে আলো দেখিও, তা হ'লেই আমি এই আঁধার পথে ধীরে ধীরে যেতে পারব—কোন কষ্ট হবে না!"

"উত্তম! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্ দিদি! ভগবান করুন, তোমার পথ সহজ সরল হ'য়ে যাক্! তবে এখন আমি আসি দিদি!"

"যাও" বলিয়া চামেলী নয়নদ্বয় বস্ত্রাঞ্চল দিয়া মুছিল।

নন্দ বলিল, "দিদি! তুমি যদি প্রাণে শান্তি না পাও, তবে আমি এ জীবনে, কোনদিন, কোন মুহূর্ত্তের জন্যও বিন্দুমাত্র শান্তি পা'ব না। তুমি হয় ত' জান না, তোমার এই সর্ব্বনাশ আমার এই বক্ষে কি পরিমাণে আঘাত দিয়েছে!—আমার বিশাল স্ফীত-বক্ষকে সঙ্কুচিত ক'রে দিয়েছে—আমার মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দিয়েছে—আমার উচ্চ আশার বাসনাকে অতল জলধিতলে ডুবিয়েছে! বল দিদি! তুমি জীবনে শান্তি পাবে!"

"হ্যাঁ, পাব!"

"সুখ ভোগে নয় দিদি! সুখ ত্যাগে! তবে আমার গাত্র ছুঁয়ে শপথ কর দিদি!—তুমি কখনও অশান্তি ভোগ করবে না,—ঈশ্বরের দান ভেবে সুখী হবে!

চামেলী কাষ্ঠবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। নন্দকুমার কিয়ৎক্ষণের জন্য থামিয়া আবার বলিল, "শপথ কর দিদি! শপথ কর!"

চামেলী শপথ করিল। নন্দ আবার বলিতে লাগিল—"সুখ-দুঃখ জিনিসটা আমাদের গ'ড়ে নেওয়া। দুঃখটাকে সুখ ব'লে আলিঙ্গন করলেই সুখ পাওয়া যায়! তবে দিদি! মনে থাকে যেন!—ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস রেখো! আমি আসি? মাঝে মাঝে আসব।"

চামেলী কোন কথা কহিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল। নন্দকুমার সে কক্ষ হইতে বাহির হইল। চামেলী আপন শয্যায় অবসন্নের মত শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিয়া সশব্দে একটি দীর্ঘ তপ্ত-নিশ্বাস ফেলিয়া গাহিল —

স্বামি ! কভু কি গো আর, খুলিবে না দ্বার,
চিরদিন রহিবে কি রুদ্ধ ?
যে দিন হেরেছি, ভাল যে বেসেছি
আমি তোমাতে(ই) হ'য়েছি মুগ্ধ !
তোমার বিরহে, ব্যথা বাজে দেহে,
সতত অশ্রু ঝরে নয়নে।
খোল দ্বার খোল, বল 'প্রিয়ে' বল,
ধর বক্ষে জড়িয়ে যতনে।
(যদি) দ্বার নাহি খোল, কোন্ প্রাণে বল,
অবলা মজিয়ে ত্যজিলে গো ?
পাব না কি কভু, তোমা প্রাণ প্রভু !
নিশিদিন বসি কাঁদিলে গো !
(যদি) আমা বিনা তুমি, সুখে থাক স্বামী !
না পেলে তোমা হব না ক্ষুব্ধ।
যদি নাহি এস, নাহি ভাল বাস,
ভাল বাসিব—হব না ক্রুদ্ধ।

সমাপ্ত